ব্যাঙের আধুলি

সুকুমার নাগ

অর্পিতা প্রকাশনী
বি-৬/১৭৫ কল্যাণী
নদীয়া

প্রকাশিকা : শ্রীমতি চন্দ্রিমা মণ্ডল
বি-৬/১৭৫ কল্যাণী
নদীয়া

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬১

ব্যবস্থাপনায় : শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল

পরিবেশক : প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ-২৪ পরগনা

প্রচ্ছদ : সুবল সরকার

মুদ্রণ : বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

ছোটদের প্রতি আমাদের সকলেরই একটা দায়বদ্ধতা আছে। আমরা সবাই চাই তাদের জীবন সুন্দর ভাবে গড়ে উঠুক। তাই তাদের ভাল লাগা না লাগার দিকে আমাদের সকলেরই সস্নেহ দৃষ্টি রাখতে হয়। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তাদের অনুসন্ধিৎসা অত্যন্ত প্রবল এবং প্রত্যাশাও অনেক। তাদের চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্র যেমনই বিচিত্র, তেমনই ব্যাপক। তারা যেমন খেলাধূলা ভালবাসে, তেমনি ভালবাসে গল্প শুনতেও। গল্পের আকর্ষণ তাদের কাছে চিরন্তন।

এই উপলব্ধির তাগিদই আমাকে 'ব্যাঙের আধুলি' বইটি প্রকাশনার প্রেরণা জুগিয়েছে। এই বইটিতে সন্নিবেশিত গল্পগুলির অধিকাংশই দৈনিক বসুমতী, বর্ত্তমান, ঘরে-বাইরে ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলি পড়ে যদি ছোটরা আনন্দ পায়, তা'হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

সুকুমার নাগ

এতে যা আছে

ব্যাঙের আধুলি

অনেকদিন আগেকার কথা। একবার এক ব্যাঙের খুব সর্দি হয়েছিল। ব্যাঙটার কিছু বলতে কিছু ছিল না যে তাই দিয়ে একটা ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাবে। তখন হঠাৎই তার মনে পড়লো, 'তাই তো, আমার তো একটা আধুলি আছে!' —সে কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

ব্যাঙের আধুলিটা ছিল বহুদিনের হঠাৎ পাওয়া সম্পদ। একবার এক সিঁধেল চোর চুরি করে একটা ডোবায় এসেছিল স্নান করতে। সেই ডোবাতেই থাকত ঐ ব্যাঙটা। সেই সময় চুরি করা একটা টাকা অসাবধানতাবশত চোরের পুঁটুলি থেকে পড়ে যায়। তখনকার দিনে একটা টাকার অনেক দাম ছিল। তাই টাকাটা পেয়ে ব্যাঙটার আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না।

কিছুদিন পর ফুলেশ্বরীর মেলা থেকে ব্যাঙটা আট আনা দিয়ে একটা ছাতা কিনে এনেছিল। ছাতা কেনার পর ব্যাঙটার হাতে ছিল একটা আধুলি। যখের ধনের মতোই ব্যাঙটা ঐ আধুলিটাকে লুকিয়ে রেখেছিল, যাতে কেউ তার হদিশ না পায়। ব্যাঙটার মনে ভয় ছিল এই যে, ঐ আধুলিটার হদিশ যদি কেউ পায় তাহলে ওটা নিশ্চয়ই তার হাতছাড়া হবে। এটা বুঝেই সে আধুলিটাকে একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। তবু চেষ্টা যে কেউ করেনি আধুলিটাকে হাতড়ে নিতে তা নয়। একবার এক তালপাতার সেপাই এসেছিল ব্যাঙটার কাছে খুব ভাল মানুষটি সেজে। এসে বলেছিল, 'ভাই ব্যাঙ, আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। আধুলিটা তুমি কোথায় রেখেছ বল, আমি

পাহারা দিয়ে রাখব।' কিন্তু ব্যাঙটাকে ঠকানো সম্ভব হয়নি। ব্যাঙটা তালপাতার সেপাইটার মতলবটা বুঝে ফেলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে মিষ্টি কথায় বিদেয় করেছিল ওকে। এরপর থেকে অবশ্য ব্যাঙটার দিন কাটছিল মোটামুটি নিরাপদেই। আধুলিটাও কাছে ছিল না, তাই ভাবনাও কিছু ছিল না বলতে গেলে। কিন্তু এই সর্দিটাই আজ আবার নতুন করে ভাবনায় ফেলেছে তাকে। 'এবার হয়তো চিকিৎসার প্রয়োজনে আধুলিটা হাতছাড়া হবেই। তা হোক, তবু যদি অসুখটা সারে!' —এই কথা ভেবে মন স্থির করে ফেলল ব্যাঙটা।

গ্রামের এক প্রান্তে ছিল ছোট্ট একটা বাজার। সেখানে ছিল এক হাতুড়ে ডাক্তার। কম পয়সায় চিকিৎসা করতে সেখানেই সবাইকে যেতে হয়। চেম্বারে বা নার্সিং হোমে চিকিৎসার খরচ অনেক! তাই ব্যাঙটা মনে মনে ঠিক করেছিল ঐ হাতুড়ে ডাক্তারকে দিয়েই সে চিকিৎসা করাবে। এই ভেবে ব্যাঙটা ডোবার গর্ত থেকে লুকানো আধুলিটা খুঁজে পেতে বার করে নিয়ে রওনা হলো বাজারের দিকে। বাজারে যেতে যেতে ব্যাঙটা দূর থেকে শুনতে পেল কারা যেন শ্মশানের দিকে একটা শব বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর ধ্বনি দিচ্ছে, 'বলহরি, হরি বোল।' লোকগুলো কাছাকাছি আসতেই ব্যাঙটা জানতে পেল যে, যে লোকটা মারা গেছে তার নাকি সর্দি হয়েছিল এবং ঐ হাতুড়ে ডাক্তারটাই তার চিকিৎসা করেছিল। ব্যাঙটা তখন হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যাওয়া নিরর্থক মনে করল। কেননা, তাতে আধুলিটাও খরচ হবে, জীবনটাও রক্ষা পাবে না। এই মনে করে ব্যাঙটা আবার ফিরে চলল ডোবার দিকে। যেতে যেতে হঠাৎ তার মনে পড়ল গ্রামের সরকারী হাসপাতালের কথা। সামান্য সর্দির চিকিৎসা তো সেখানেই হতে পারে। —এই কথা ভেবে ব্যাঙটা রওনা হলো হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালের যেখানে ওষুধ দেওয়া হয়, সেই ঘরটার দরজার পাশে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাঙটা রুগীদের ওষুধ দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য

করতে লাগল। লম্বা লাইন পড়েছিল রুগীদের। একটা মোটা লোকও দাঁড়িয়েছিল ঐ লাইনে। তার সর্দি হয়েছে। ডাক্তারবাবু তাকে সিরিঞ্জ দিয়ে ইঞ্জেকশন দিচ্ছিলেন। লোকটা চিৎকার করে উঠেছিল মোটা ছুঁচের খোঁচা খেয়ে। এ-দৃশ্য দেখে ব্যাঙের চোখ দুটো বার কয়েক পাক খেয়ে গেল। ভয়ে লাফাতে লাফাতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল ব্যাঙটা। যাবার সময় অবশ্য হাসপাতালের পাশের টিউবওয়েলের পার থেকে পেট পুরে জল খেয়েছিল ব্যাঙটা। আশ্চর্যের বিষয়! এরপর ব্যাঙের সর্দিটা এমনিতেই সেরে গিয়েছিল। আধুলিটাও আর তাকে ব্যয় করতে হয়নি। কিন্তু আধুলিটা যে সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার সন্ধান আজও কেউ পায়নি।

প্রতিবেশীর সদ্ভাব

রাণাঘাট শহরকে বাঁয়ে রেখে সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে চূর্ণী নদী যেখানে আন্মুলিয়া গ্রামে পৌঁছেছে, ঠিক সেখানেই নদীর বাঁকে দেখা যাবে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ। এককালে অনেক বাদুড়ের আস্তানা ছিল এই গাছটাতে। তাই আজও লোকে এটাকে বলে, 'বাদুড় ঝোলা বট গাছ'। এখন অবশ্য বাদুড়ের কোন হদিশই মিলবে না এখানে : পরিবর্তে দেখা যাবে পরিত্যক্ত বট গাছের কোঠরে বেশ বড়সড় আকারের একটা পেঁচা। পেঁচাটার বয়স হয়েছে অনেক। জরাগ্রস্ত পেঁচাটা বাসা ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না বড় একটা। যে বয়সে মানুষ পরমুখাপেক্ষী হয়, পেঁচাটার ঠিক তেমনি বয়স। তবু, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই যত কষ্টই হোক, তার এই নিঃসঙ্গ জীবনে নিজের আহার নিজেকেই সংগ্রহ করতে হয়।

কিছুদিন আগে এই বট গাছটাতে এসে বাসা বেঁধেছে একটা শালিক। নতুন প্রতিবেশীকে পেয়ে পেঁচা মনে মনে বেশ আনন্দিত। কারণ, সে মনে মনে এই আশা পোষণ করছিল যে, প্রতিবেশী হিসেবে সে নিশ্চয়ই শালিকের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হবে না। একদিন সন্ধ্যেবেলা সে গিয়ে উপস্থিত হলো শালিকের বাসায়। শালিকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু পেঁচার এই আগবাড়িয়ে ভাব জমানোর ব্যাপারটাকে তেমন ভাল চোখে দেখলো না শালিক। মাত্র ক'দিন আগে শালিকটার কতকগুলো বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাদের পরিচর্যা করতে করতেই শালিকটা দু-এক কথায়

বিদেয় করলো পেঁচাটাকে। যা দিনকাল পড়েছে তাতে হঠাৎ করে পেঁচাটাকে বিশ্বাস করা বা তার সঙ্গে বেশী মাখামাখি করাটা যুক্তিযুক্ত মনে করলো না শালিকটা।

অগত্যা কিছুটা ক্ষুণ্ণ মনেই নিজের কোঠরে ফিরে এলো পেঁচাটা। সে অন্ধকার কোঠরে বসে বসে কেবলই ভাবতে লাগলো—যে করেই হোক শালিকের বিশ্বাসভাজন তাকে হতেই হবে। পেঁচাটার সন্তান-সন্ততি কেউ ছিল না। তাই, শালিকের বাচ্চাগুলোকে দেখে বাৎসল্য স্নেহে ভরে উঠলো তার মন। অন্ধকার কোঠরে বসেও তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো শালিকের বাচ্চাগুলোর মুখচ্ছবি। এদিকে শালিকটা তখন নানা দুর্ভাবনায় বিচলিত। পেঁচাটা বড় বড় দুটো চোখ মেলে তাকিয়েছিল ওর বাচ্চাগুলোর দিকে। এটা ওর নজর এড়ায়নি। তাই সে ভাবছিল, হয়তো সুযোগ পেলেই পেঁচাটা ওর বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে খাবে! এই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই শালিকটা বাচ্চাগুলোকে রেখে কোথাও যায় না। শুধুমাত্র দুপুরবেলা পেঁচাটা যখন গাছের কোঠরে বসে বসে ঝিমোয়, তখন ফাঁক বুঝে শালিকটা দক্ষিণের মাঠ থেকে চটপট খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। নিজে খায় এবং বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়।

একদিন দুপুরবেলা পেঁচাটা বট গাছের কোঠরে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল, শালিকের বাচ্চাগুলোর সমবেত আর্ত চিৎকার। পেঁচাটা তৎক্ষণাৎ কোঠরের বাইরে এসে দেখতে পেল যে, একটা বেড়াল গুটি গুটি পায়ে শালিকের বাসাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তা দেখে বাচ্চাগুলো পরিত্রাহি চিৎকার করছে। কালবিলম্ব না করে পেঁচাটা উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বেড়ালটার ওপর। সেই সময় দক্ষিণের মাঠ থেকে খাবার নিয়ে ফিরছিল শালিকটা। ফিরতে ফিরতেই সে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল—পেঁচাটা ধারালো নখ দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে বেড়ালটাকে এবং বিপদ বুঝে বেড়ালটা তরতর করে গাছ থেকে নেমে যাচ্ছে মাটিতে।

এই ঘটনার পর শালিক এবং পেঁচার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব। এরপর থেকে শালিক দিনের বেলা পেঁচার ভরসায় বাচ্চাগুলোকে রেখে নিশ্চিন্ত মনে খাবার সংগ্রহে যায়। সন্ধ্যেবেলা পেঁচা উড়ে গিয়ে বসে শালিকের বাসার কাছাকাছি একটা ডালে। শালিকের কাছ থেকেই সে জেনে নেয় দক্ষিণের মাঠের খবরা-খবর। তারপর শালিকের কথামত পেঁচা উড়ে যায় দক্ষিণের মাঠে এবং জমির আলে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। ধানক্ষেতের আলের গর্ত থেকে মেঠো ইঁদুর বেরিয়ে আসামাত্র ছোঁ মেরে ধরে ফেলে পেঁচাটা এবং সোজা ফিরে আসে গাছের কোঠরে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। রাত্রিবেলা অন্যান্য দিনের মতই পেঁচাটা দক্ষিণের মাঠে গেল ইঁদুরের খোঁজে। কিন্তু ফিরে এলো কি-না তা বোঝা গেল না। সেদিন প্রহরে প্রহরে পেঁচার ডাক শুনতে পেল না শালিকটা। সে প্রমাদ গুণলো মনে মনে। দুশ্চিন্তায় কাটলো সারাটা রাত। তারপর পূব আকাশটা ফর্সা হতে না হতেই শালিকটা উড়ে গেল দক্ষিণের মাঠে। সেখানে গিয়েই শালিকটা দেখতে পেল যে, পেঁচাটা একটা সাপের সঙ্গে বাঁচার জন্য প্রাণপণ লড়ছে। সাপটা আলের একটা গর্তের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়েছিল খানিকটা; ইঁদুর ভেবে সেটাকে ছোঁ মেরে ধরতে গিয়েছিল পেঁচাটা আর তাতেই এই বিপত্তি। পেঁচার বিপন্ন দশা দেখে উদ্বিগ্ন শালিকটা তৎক্ষণাৎ উড়ে গেল আন্দুলিয়ার বড় মাঠের দিকে এবং মুহূর্তে ডেকে নিয়ে এলো এক ঝাঁক শালিককে। তারপর সংঘবদ্ধ আক্রমণে শালিকগুলো অচিরেই কাবু করলো সাপ-টাকে। সাপের কবল মুক্ত হয়ে পেঁচা নিরাপদে ফিরে এলো নিজের কোঠরে। শালিকের বাচ্চাগুলো সেদিনই প্রথম উড়ে এসে বসলো পেঁচার কোঠরের মুখে। তা দেখে খুশীতে ভরে উঠলো পেঁচার মন। লোকের কাছে এই বট গাছটা এখনও পরিত্যক্ত 'বাদুড় ঝোলা বটগাছ' হলেও শালিকের বাচ্চাগুলোর সাহচর্যে পেঁচার কাছে এটাই এখন 'বার্ধক্যের বারাণসী'।

ঝণ্টু ও হাতি

ফেরিওয়ালা ঝড়ু কাকু প্রতিদিন ঝণ্টুদের পাড়ায় আসে। আইসক্রীমের বাক্সটা কাঁধে নিয়ে চলতে চলতে হাঁক ছাড়ে, 'আইসক্রীম, ঠাণ্ডা মালাই···।' ঝণ্টুর ভারি পছন্দ ফেরিওয়ালা ঝড়ু কাকুর ঐ কথাগুলো শুনতে। একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঝণ্টুকে পাশে নিয়ে ওর মা শুয়েছিলেন। ঘরের দরজা-জানালাগুলো ছিল সবই বন্ধ। মাথার ওপর ঘুরছিল সিলিং ফ্যানটা। ঝণ্টুর চোখে ঘুম নেই একটুও। মা ঘুমিয়ে পড়তেই ঝণ্টু উঠে পড়ল বিছানা থেকে। রাস্তার দিকটার জানালাটা খুলে দিল। বাইরে তখন খাঁ-খাঁ করছে রোদ্দুর। বাড়ির সামনেকার গলিটা তখন একেবারে ফাঁকা, জনমানবশূন্য। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে ঝণ্টুর মনটাও। সঙ্গী-সাথী কেউ নেই। পাশের বাড়ীর পিঙ্কুও এ-সময় বাড়ি থাকে না। সে তখন স্কুলে। ঝণ্টুর ভর্তির বয়স হয়নি। বাবা বলেছেন ওকে আগামী বছর স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

কি আর করে ঝণ্টু! আলমারি থেকে খেলনাগুলো সব টেনে বের করে এক-সময়। চাবি দিয়ে চালানো মোটর গাড়িটা চালাতে থাকে। ওটা ওর খুব পছন্দ। গত বছর রথের মেলা থেকে বড় পিসি কিনে দিয়েছিলেন মোটর গাড়িটা। কিন্তু ওটার চেয়েও ঝণ্টুর বেশী পছন্দ ছোট মামার হাতিটা। খেলতে খেলতে ঝণ্টু লক্ষ্য করছিল, মোটর গাড়িটা চলতে চলতে হাতিটার সামনে এসেই থেমে যায়। হাতিটাকে ঠেলে এগোতে পারে না! মনে মনে ঝণ্টু তারিফ করে হাতিটার। ভাবে, 'সত্যি, হাতিটার গায়ে খুব শক্তি।'

ঠিক সেই সময়ে ঝণ্টু শুনতে পায় ফেরিওয়ালা ঝড়ু কাকুর হাঁক-

ডাক, 'আইসক্রীম্, ঠাণ্ডা মালাই···।' ফেরিওয়ালা ঝড়ু কাকুকে খুব ভাল লাগে ঝন্টুর। প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর দিন ঝড়ু কাকু ঠোঙা ভর্তি করে পলাশ ফুল এনে দেয় ঝন্টুকে। ঝন্টু সেই ফুল দিয়ে অঞ্জলি দেয়। ঝড়ু, কাকু হাঁক দিতে দিতে কাছাকাছি আসতেই ঝন্টু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা আইসক্রীম কিনে নেয়।

ইতিমধ্যে মা'র ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি উঠে পড়েন বিছানা থেকে। ঝন্টু মাকে বলে, 'জান মা, হাতির গায়ে না দারুণ শক্তি, মোটর গাড়ি আটকে দেয়।' শুনে মা বলেন, 'ও—তাই বুঝি! কি করে বুঝলি?' ঝন্টু তখন ওর অভিজ্ঞতার কথা মাকে সব বলে। মা বলেন, 'ও—তাই।' বলেই বেরিয়ে যান রান্নাঘরের দিকে। ঝন্টু বলতে থাকে, 'ঝড়ু কাকু না,—খুব বোকা। কেন সে অত কষ্ট করে আইসক্রীমের বাক্সটা কাঁধে করে নিয়ে বেড়ায়? একটা হাতি কিনে নিলেই তো পাবে! ঝন্টু মনে মনে ঠিক করে পরদিন ঝড়ু কাকুকে হাতি কেনার কথা সব বলবে।

কিন্তু পরদিন ঝড়ু কাকুকে আর দেখা গেল না। সেদিনও দুপুরবেলা ঝন্টু শুয়েছিল মায়ের কাছে। তারপর মা ঘুমিয়ে পড়তেই রাস্তার দিকটার জানালাটা খুলে দিয়েছিল সে। প্রতীক্ষা করছিল ঝড়ু কাকু কখন আসবে তার জন্য। কিন্তু না, ঝড়ু কাকুকে আর দেখা গেল না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তাও না। ঝন্টু ভাবল, হয়তো ঝড়ু কাকুর অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে, তাই আসেনি। কিন্তু পর পর বেশ কিছুদিন ঝড়ু কাকু না আসাতে ঝন্টুর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল।

প্রায় মাস তিনেক পরের কথা। কোন এক রবিবারের দুপুরবেলা ঝন্টু ওদের বারান্দায় বসে পিঙ্কুর সঙ্গে খেলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ ওর ছোটমামা এসে হাজির। তিনি এসে বললেন, 'চল ঝন্টু, চিড়িয়াখানা দেখে আসি।' চিড়িয়াখানায় গিয়ে বানর আর শিম্পাজীর খাঁচা-ঘরগুলো পেরিয়েই ঝন্টু দেখতে পেল একটা বড় গাছের তলায় কয়েকটা বড় বড় হাতি। একটা হাতির পিঠে একটা

লোক বসেছিল। একটু কাছাকাছি হতেই ঝণ্টু দেখে অবাক হয়ে গেল—লোকটি অন্য কেউ নয়, তার সেই ফেরিওয়ালা ঝড়ু কাকু। ঝড়ু কাকুও ইতিমধ্যে দেখেছিল ঝণ্টুকে। ঝণ্টুকে দেখেই ঝড়ু কাকু হাতির শুঁড় বেয়ে তরতর করে নেমে এলো। তারপর বলল, এসো ঝণ্টু, হাতির পিঠে চড়বে এসো।' বলেই ঝড়ু কাকু এগিয়ে এসে ঝণ্টুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল হাতিটার কাছে। যাবার সময় ঝণ্টু ছোট-মামার দিকে একবার ফিরে তাকাল। কিন্তু এতে ছোটমামার কোন আপত্তি আছে বলে মনে হলো না।

হাতির কাছে এসেই ঝড়ু কাকু মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করল। অমনি পাহাড়ের মত শরীরটাকে নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল সেই হাতিটা। তখন ঝণ্টুকে নিয়ে ঝড়ু কাকু উঠে পড়ল হাতিটার পিঠে। হাতিটা তখন শুঁড় বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে কলাগাছের টুকরোগুলো খাচ্ছিল আর আনন্দে দুলছিল পা নেড়ে। ব্যাপারটা দারুণ ভাল লাগছিল ঝণ্টুর। অবশ্য একটু ভয় ভয়ও যে করছিল না হাতির পিঠে চড়ে তা নয়।

চিড়িয়াখানা থেকে বাড়ি ফিরে এসে নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ছিল ঝণ্টু। ঝণ্টুর বার বার মনে পড়ছিল ঝড়ু কাকুর কথা, হাতিটার কথা। সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছিল ঝণ্টু। ঝড়ু কাকু হাতির পিঠে চেপে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আইসক্রীমের বাক্সটা নিয়ে যাচ্ছে ওদের বাড়ির সামনেকার গলি দিয়ে। আর তার ঠিক পেছনেই বসে আছে ঝণ্টু নিজে। হাতিটার সামনে ঠিক তার খেলনা মোটর গাড়ি এবং হাতিটার মত করেই লাইন করে দাঁড়িয়ে গেছে অনেক মোটর গাড়ি। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা সবাই ছুটে এসেছে আইসক্রীম কিনতে। ছুটে এসেছে পাশের বাড়ির পিঙ্কুও। সে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ঝণ্টুর দিকে। এর পর হঠাৎই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ঝণ্টুর। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সেই সময় পাশের বাড়ির পিঙ্কুদের রেডিও থেকে ভেসে আসছিল ঝণ্টুর প্রিয় গানের একটা কলি—চল্ চল্ চল মেরে হাতি··· ।

মালতীদি

মালতীদি প্রতিদিন খুব সকালে পিংকুদের বাগানে ফুল তুলতে আসে। পিংকুদের পাড়াতেই মালতীদি থাকে ওর মামা-বাড়িতে। মা-বাপ মরা এই মেয়েটির কেউ নেই, একমাত্র মামা ছাড়া। সে সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে যাতায়াতের পথে পিংকু প্রায়ই মালতীদিকে দেখে ওর মামা-বাড়ির বারান্দায় অথবা উঠানে একটা না একটা কাজ করতে। পিংকুদের বাগানে ফুল তুলতে যাওয়ার সূত্রেই মালতীদি ও পিংকু পরস্পরকে চিনত।

একদিন পিংকু গাজনতলার মেলায় গিয়েছিল ওর মায়ের সঙ্গে। সেখানে হঠাৎই সে শুনতে পেল, কে যেন ওকে ডাকছে পিছন থেকে। পিছন ফিরে তাকাতেই পিংকু দেখেছিল মালতীদিকে। মালতীদির হাতে ছিল বেশ কয়েকটা পাঁপর ভাজা। এগিয়ে এসেই মালতীদি পিংকুকে বলেছিল, 'নে পিংকু' খা!' —বলেই, মালতীদি পিংকুর দু'হাত ভরে পাঁপর ভাজা দিয়েছিল খেতে। সেই থেকেই মালতীদির সঙ্গে পিংকুর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল আরও ঘনিষ্টভাবে। মনে হতো, ওরা যেন ঠিক দুই সহোদর ভাই-বোন।

একদিন সকাল বেলাকার কথা। তখনও সূর্য উঠেনি। পিংকু বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মালতীদির কথা। উঠি উঠি করেও সে বিছানা ছাড়ছিল না। এ-পাশ ও-পাশ করছিল আর গা মোড়া দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। এমন সময় জানালার বাইরে শোনা গেল মালতীদির গলা, —'কী রে পিংকু, ঘুম ভাঙ্গল?' ডাক শুনেই পিংকু জানালাটা খুলে

দেখতে পেল, একটা লাল পেড়ে শাড়ি পরে মালতীদি ওদের বাগানের শিউলীতলা থেকে ভোরের শিশির ভেজা ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছে সাজিতে।

পিংকুর মা আগেই উঠে গিয়েছিলেন কলতলায়। দরজাটা ভেজানো ছিল। পিংকু ভেজানো দরজাটা খুলেই দিল এক ছুট্। সোজা চলে গেল শিউলীতলায়। তারপর দু'হাত ভ'রে শিউলী ফুল কুড়িয়ে তুলে দিল মালতীদির সাজিতে। মালতীদি ওর আঁচলে বাঁধা একটা ডাসা পেয়ারা পিংকুর হাতে দিয়ে বলল, 'এটা খাস্ পিংকু। কাশীর পেয়ারা। ঝিকুদের বাগান থেকে এনেছি। কাল ফের তোকে এনে দেব'খন।'

পেয়ারাটা হাতে নিয়ে ভারি খুশী হ'ল পিংকু। খুশীর ভাবটা উপচে পড়ল ওর চোখে-মুখে। পিংকু ড্যাব-ড্যাব করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পেয়ারাটার দিকে। তারপর বলল, 'মালতীদি, এতে দাগগুলো কিসের ?'

মালতীদি বলল, 'ও কিছু নয়। দু'টো দাগ বাদুড়ের আর বাকি-গুলো আমার। বাদুড়ে কামড়ে ছিল বলেই তো ওটা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

পিংকু বলল, 'কিন্তু, তুমি কামড়ে ছিলে কেন ?' ভারিক্কি মেজাজে মালতীদি বলল, 'ওমা, তুই তাও জানিস্‌নে ! ওটা করতেই হয়। নইলে অন্যের লোভ লাগে, তাতে যে খায় তার পেট খারাপ করে।'

মালতীদির কথা শুনে পিংকু চুপ হ'য়ে গেল। একবার শুধু বলল, 'তাই বুঝি !'

পরদিন সকালেও মালতীদি একইভাবে জানালার বাইরে থেকে ডাকল, 'এই পিংকু, পিংকু —উঠে আয়।' পিংকু ওর ঠাকুমার কাছে শুনেছিল, রাত্রি বেলায় কেউ একবার ডাকলে কখ্‌খনো ঘরের বাইরে যেতে নেই। পরীরা নাকি ঐভাবেই ডাকে। কিন্তু এ ডাক যে মালতীদির তাতে পিংকুর কোনই সন্দেহ ছিল না। তাই, সে তক্ষুনি চলে গেল ঘরের বাইরে, বাগানের দিকে।

বাগানে যেতেই হাসতে হাসতে এগিয়ে এল মালতীদি। এসেই

বলল, 'চল্ পিংকু, ঝিকুদের বাগানের পেয়ারা কুড়িয়ে আনি গে। এখন গেলে বাদুড়-চোষা কাঠবাদামও পাওয়া যাবে। আমার একা যেতে ভাল লাগছে না তাই তোকে বলা।'

এতক্ষণ পিংকু অন্য কিছু ভাববার অবকাশ পায়নি। ঝোঁকের মাথায় সে ছুটে এসেছিল মালতীদির কাছে। এবার কিন্তু ওর মনে হ'লো নানান কথা। রাত তখনও ভোর হয়নি। বেলে বেলে জোৎস্নার আলো তখনও ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। এমনি রাতেই তো ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যায় পরীরা। তবে কি মালতীদি আসলে পরী? —পিংকু ভাবলো।

পিংকুকে চুপ্ ক'রে থাকতে দেখে মালতীদি ওর হাত ধরে টানতে টানতে চপলা হরিণীর মতই ছুট্‌তে আরম্ভ করল। একবার মাত্র বলল, 'হ্যারে, ভয় করছে নাকি রে তোর পিংকু?' —পিংকুকে নিরুত্তর দেখে মালতীদি আবারও বলল, 'কিসের ভয় রে? ভূতের? ভীতু কোথাকার। ব্যাটা ছেলের আবার এত ভয় কিসের রে?' —বলেই, মালতীদি আগের মতই পিংকুর হাত ধরে টানতে টানতে হাজির হ'লো ঝিকুদের বাগানে। তারপর বেশ কতকগুলো পেয়ারা আর কাঠবাদাম কুড়িয়ে নিয়ে ওরা যখন ফিরল, তখন রাত ভোর হ'য়ে গেছে।

ফেরার সময় হঠাৎই মালতীদি একবার বলল, 'ভাল কথা, আয় পিংকু, তোকে একটা জিনিস দেখাই।' বলেই, মালতীদি পিংকুকে হিড়্‌হিড়্ ক'রে টেনে নিয়ে গেল একটা পুকুরের কিনারায়। সেখানে মাটির সঙ্গে প্রায় লেপটে ছিল একটা গাছ। গাছটার পাতাগুলো সবুজ। দেখতে অনেকটা তেঁতুল পাতার মত। পিংকু দেখল, মালতীদি পাতা-গুলোতে হাত ছোঁয়ানো মাত্রই পাতাগুলো ঢলে পড়ছে। পিংকু অবাক হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। মালতীদি বলল, 'এ গাছ তুই কখনও দেখিস্ নি, তাই না? একে বলে লজ্জাবতী গাছ। তোর মতই ভীতু আর লাজুক এই গাছগুলো।' শুনে লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল পিংকুর মুখটা।

কয়েকদিন পরের কথা। বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরছিল পিংকু। মালতীদি দাঁড়িয়েছিল ওর মামাবাড়ির সামনেকার রাস্তার কাছেই। পিংকুকে দেখেই মালতীদি ওকে ইশারায় ডাকল। তারপর কথায় কথায় বলল, 'আজ সন্ধ্যে বেলায় বারোয়ারী তলায় পুতুল নাচ হবে। তুই যাবি আমার সঙ্গে?' পিংকু রাজী হয়ে গেল এক কথায়। মালতীদি বলল, 'তাহ'লে আমি তোকে তোদের বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসব, কেমন?'

মালতীদি'র কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দেখা গেল পিংকুর বাবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছেন। পিংকু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ওর বাবার কাছে। পিংকুর বাবা দু'চোখ পাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিলেন পিংকুকে। বাবার এই আচরণের কারণটা অবশ্য পিংকুর বোধগম্য হ'লো না। সে হতভম্ব হ'য়ে গেল খানিকটা।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছিল। কি একটা কারণে মালতীর মামার সঙ্গে পিংকুর বাবার মন কষাকষি হয়েছিল। তাই পিংকুর বাবা ওকে মালতীদের বাড়ি যেতে নিষেধ করলেন। ওদিকে সেদিন রাত্রেই মালতীর মামাও একই কারণে মালতীকে পিংকুদের বাগানে ফুল তুলতে যেতে মানা করেছিলেন।

তারপর থেকেই মালতীদি পিংকুদের বাগানে ফুল তুলতে আসে না। স্কুলে যাতায়াতের পথেও মালতীদিকে আগের মত দেখতে পায় না পিংকু। একদিন রাত্রি বেলায় শুয়ে শুয়ে পিংকু কেবলই ভাবছিল মালতীদির কথা। ভাবতে ভাবতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখছিল —মালতীদি ওকে জানালার বাইরে থেকে ডাকছে। জানালা খুলে পিংকু দেখল, মালতীদি শিউলী গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে। ভেজানো দরজাটা খুলে পিংকু তক্ষুণি ছুটে গেল মালতীদির কাছে। রাত তখনও ভোর হয়নি। বেলে বেলে জোৎস্নায় লালপেড়ে শাড়ি পরা মালতীদিকে পরীর মতই সুন্দর মনে হচ্ছিল পিংকুর। কাছে যেতেই মালতীদি পিংকুকে ঝিকুদের বাগানের একটা বাদুড়-চোষা পেয়ারা দিল হাত বাড়িয়ে। পেয়ারাটা নিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে

মায়ের গায়ে হাত লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল পিংকুর। মা বললেন, 'কী রে পিংকু, স্বপ্ন দেখ্‌ছিলি বুঝি?' পিংকু সে কথার উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি জানালা খুলে বাইরে তাকাল। চারিদিক স্তব্ধ। বেলে বেলে জ্যোস্নায় ভ'রে গেছে বাগানটা। শিউলীতলায় কালো ছায়া পড়েছে গাছটার। সেখানে মালতীদিকে দেখতে পেল না পিংকু। একটু পরে ভোর হ'তেই বিছানা থেকে উঠে শিউলীতলায় গিয়ে পিংকু দেখল, ফুলগুলো সব তেমনি বিছিয়ে পড়ে আছে। পিংকুর দু'চোখ জলে ভ'রে গেল।

ভিজে বেড়াল

আষাঢ় মাস। সমস্ত আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ঘনঘটা। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। টুপাই রান্নাঘরের বারান্দায় বসে এতক্ষণ পড়ছিল। পড়া শেষ করে টুপাই সবে পুতুল খেলা শুরু করেছে, ঠিক সেই সময় মা বললেন, খুকু, ঘরের দিকটাতে একটু লক্ষ্য রাখিস তো মা। কড়াইতে ভাজা মাছ রয়েছে। দেখিস, বেড়াল ঢুকে যেন আবার মাছগুলো সব না খায়। কথাগুলো বলেই রান্নাঘরের দরজাটা একটু ভেজিয়ে রেখে মা কি একটা কাজে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

টুপাই ওর গায়ের চাদরটাকে আরও একটু ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে পুতুল খেলায় মনোযোগ দিল। গতকাল বিকেলে টুপাই গিয়েছিল শিবু কাকার দোকানে। রেল বাজারে শিবু কাকার দরজির দোকান। সেখান থেকে অনেক খুঁজে পেতে পুতুলের জন্য ম্যাচিং করা কাপড়ের ছিট নিয়ে এসেছে টুপাই। শিবু কাকাকে দিয়েই তৈরি করে এনেছে পুতুলের শাড়ী, ব্লাউজ, ওড়না ইত্যাদি। ফুল ভয়েলের তৈরি পুতুলের পোষাক-গুলো ওর খুবই মনোমত হয়েছিল। পোষাক পরানোর পর পাশের বাড়ির শিউলীর পুতুলের চেয়েও টুপাইয়ের কাছে ঢের বেশি সুন্দর মনে হচ্ছিল ওর পুতুলটাকে। পুতুল সাজানোর সময় টুপাই মনে মনে কেবলই তুলনা করছিল শিউলীর পুতুলের চেয়ে ওর পুতুলটা আজ কতটা বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তাই। হঠাৎ টুপাইয়ের মনে পড়ল পুঁতির মালাটার কথা। ওটা তো পরানো হয়নি। টুপাই তখন রান্নাঘরের মিট সেফ থেকে পুঁতির মালাটা আনতে গেল। ফেরার সময় সে দেখল উঠান থেকে বৃষ্টিতে ভিজে একটা বেড়াল লাফিয়ে টপকে উঠল বারান্দায়। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে সটান ঢুকে গেল রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে।

টুপাই বেড়ালটাকে যেন দেখেও দেখল না। বারান্দায় বসে বসে একমনে পুঁতির মালা দিয়ে পুতুল সাজাতে লাগল।

প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে মা অন্য ঘর থেকে যথাসময়ে ফিরে এলেন এবং কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকতেই পাশ কাটিয়ে বেড়ালটা ঘর থেকে বের হয়ে গেল ছুটে লাফাতে লাফাতে। টুপাইয়ের মা রান্না ঘরে ঢুকেই প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন. যা ভেবেছি তাই। হতচ্ছাড়া মেয়ে-টাকে দিয়ে যদি এইটুকুও কাজ হয়। তারপর প্রায় শূন্য কড়াইটার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বললেন, এতগুলো মাছ!··· ইতিমধ্যে বৃষ্টিটা একটু সময় ছেড়ে গিয়েছিল। টুপাইয়ের মায়ের চেঁচামেচিতে—'কি হয়েছে বৌমা' বলেই ঠাকুমা এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। টুপাইয়ের ঠাকুমা গিয়েছিলেন শিউলীদের বাড়ি রামায়ণ পাঠ শুনতে। সুগ্রীব সেনার সহায়তায় শ্রীরামচন্দ্র তখন সবেমাত্র সেতুবন্ধ রচনা করতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই সময় বাড়িতে এই লঙ্কাকাণ্ড। চেঁচামেচি শুনে টুপাইয়ের ঠাকুমা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন বৌমা হয়তো টুপাইকে পড়াশুনা না করার জন্য বকাবকি বা মারধোর শুরু করেছে। এদিকে মায়ের চেঁচামেচিতে টুপাইও ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং বেড়ালে মাছ খাওয়ার জন্য শাস্তি অনিবার্য ভেবে খুবই ভীত হয়ে পড়েছিল। মায়ের শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি পেতে মনে মনে সে ঠাকুমাকেই স্মরণ করছিল এতক্ষণ। ঠাকুমা এসে কিন্তু বেড়ালে মাছ খাওয়ার জন্য টুপাইয়ের মাকেই দোষারোপ করলেন এবং বললেন যে, ঐটুকু দুধের শিশুর উপর বেড়াল তাড়ানোর দায়িত্ব দেওয়াটা তার মোটেই উচিত হয়নি। কেননা, সেক্ষেত্রে বেড়ালটা যে টুপাইকে আঁচড়ে-হিঁচড়ে দিতনা—তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়! ঠাকুমার কথায় টুপাইয়ের মা ভাগ্যের উপর দোষারোপ করে দু'চার কথা বলে চুপ করে চুপসে গেলেন শেষ পর্যন্ত। দেখতে দেখতে কেটে গেল সারাটা দিন। রাত্রিবেলা টুপাই ওর মায়ের কাছেই শুয়েছিল। অন্য সময় দেখা গেছে যেদিনই মায়ের খুব রাগ হয় টুপাইয়ের উপর, সেদিনই টুপাই রাত্রিবেলায়

গিয়ে শোয় ওর ঠাকুমার কাছে। আজই প্রথম টুপাই এসে শুয়েছিল ওর মায়ের কাছে। হয়তো এই ভরসায় যে, সে বুঝেছিল মা ওর প্রতি ততটা রাগ করেননি।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা একসময় টুপাইকে বললেন, 'হ্যারে টুপাই, বেড়ালটা যে রান্নাঘরে ঢুকেছিল তা কি তুই দেখিসনি?' টুপাই বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছিলাম। মা বললেন, 'তাড়াস নি কেন তাহলে?'

টুপাই বলল, 'বেড়ালটা বৃষ্টিতে ভিজেছিল।' আমি দিদিকে একটা বইতে পড়তে শুনেছিলাম, ভেজা বেড়াল ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। তাই ভাবলাম···।' টুপাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই ওর মায়ের ম্লান মুখেও হাসি ফুটে উঠল। টুপাইকে তিনি বুকের কাছে টেনে নিলেন এবং মুহূর্তে ভুলে গেলেন বেড়ালে মাছ খাওয়ার সব দুঃখ।

সরস্বতীর শাস্তি

প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষার পর রেজাল্ট আউট হতে না হতেই পিংকু ওর মামার বাড়ি বেড়াতে যায়। এটা ওর বরাবরের অভ্যাস। এ বছরও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়েই সে চলে গিয়েছিল ওর মামার বাড়ি। পিংকুর মামা-বাড়ি কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি এক গ্রামে। সেখানে গিয়ে এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়েছিল পিংকুর।

মামাবাড়ি যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরই শুরু হয়েছিল সরস্বতী পুজো। সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধ্যেবেলায় ছোট মাসীর সঙ্গে পিংকু গিয়েছিল ঠাকুর দেখতে। স্থানীয় ক্লাবের ঠাকুরটাই ছিল ঐ গ্রামের চিরাচরিত বড় রকমের আকর্ষণ। তাই, পিংকু প্রথমেই ওর ছোট মাসীর সঙ্গে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু পিংকু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, এবার আর তেমন জাঁকজমক করে পুজো হচ্ছে না। সাদাসিধে একটা প্যাণ্ডেল করা হয়েছে। প্রতিমাও অন্যান্য বছরের তুলনায় নিতান্তই সাধারণ। দেখলেই বোঝা যায়, উদ্যোক্তাদের উদ্যমের অভাব রয়েছে এই পুজোতে। ছোট মাসীর কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছিল পিংকু। কিন্তু সেও এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি। উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিচিত এমন কেউ কাছে-পিঠে ছিল না, যার কাছ থেকে পিংকু জানতে পারবে এর কারণটা কি? কাজেই ঠাকুরকে প্রণাম করে পিংকু ওর মাসীর হাত ধরে চলে এসেছিল সেখান থেকে।

এর পর মাত্র দিন দু'য়েক পরের কথা। পিংকু ওর মাসির সঙ্গে বিকেলের দিকে বেড়াতে গিয়েছিল জলঙ্গীর তীরে। সেখানে গিয়ে

একটা বটগাছের নীচে বসেছিল পিংকু এবং ওর মাসি। হঠাৎই কয়েকটা ছেলে হৈ-হৈ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হল। ওদের সঙ্গে ছিল একটা সরস্বতী ঠাকুর। পিংকু ভেবেছিল ওরা নিশ্চয়ই ঠাকুরটা বিসর্জন দিতেই এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গল ওর। ছেলেরা শ্লোগান দিচ্ছিল, 'আসছে বছর, আর হ'বে না', 'আমাদের ক্লাব দিচ্ছে ডাক, সরস্বতী পুজো নিপাত যাক', ইত্যাদি। হৈ-হৈ করতে করতে এবং শ্লোগান দিতে দিতে ছেলেগুলো সেখানে এল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সরস্বতী ঠাকুরটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখল বটগাছের উঁচু একটা ডালে।

ছেলেগুলোর এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে পিংকু রীতিমত অবাক হয়ে গেল। এমন একটা কাণ্ডও যে কখনও ঘটতে পারে এটা ছিল পিংকুর ধারণার অতীত। ঘটনার আকস্মিকতায় পিংকু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিছু সময় পর পিংকু বটগাছটার দিকে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল যে, ঠাকুরটা ঐ ক্লাবেরই। এরপর ছেলেরা সব যেভাবে এসেছিল সেভাবেই হৈ-হৈ করতে করতে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই ফিরে চলে গেল। ছেলেদের এই আচরণের কারণ কি জানার জন্য পিংকু খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। এজন্য অবশ্য পিংকুকে বেগ পেতে হয়নি মোটেই। বাড়ি ফিরে এসে রাত্রিবেলায় ছোট মামার কাছ থেকেই সে শুনেছিল সব কথা। ক্লাবের নেতৃস্থানীয় কয়েকটা ছেলেই নাকি ছিল ঐ ঘটনার পাণ্ডা। ওরা প্রতি বছরই জাঁক-জমক করে পুজো করে আর প্রতি বছরই একই ভাবে পরীক্ষায় করে ফেল। ওরা সেজন্যই সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি এতটা রুষ্ট হয়েছিল। ছোট মামা আরও বললেন যে, এবার উদ্যোগের অভাবে ক্লাবের পুজোটাই বাতিল হবার উপক্রম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়েই নমঃ নমঃ করে কোন রকমে পুজোর ব্যবস্থাটা হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর বিসর্জনের ব্যাপারে একরকম গোয়ার্তুমি করেই নাকি ডানপিটে ঐ ছেলেগুলো ঐ কাণ্ডটা করেছে। ছোটমামা ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন ওরা সরস্বতী ঠাকুরকে ঐভাবে

ঝুলিয়ে রাখল বটগাছের ডালে ? উত্তরে ছেলেটি নাকি অভিমানের সুরে বলেছিল, 'ঝুলিয়ে রাখব না তো কি ! আমরা প্রতি বছর ঘটা করে পুজো করি। আমাদের প্যাণ্ডেল পাড়ায় বরাবর ফার্স্ট হয়। প্রতি বছর ঠাকুরকে ভক্তি করে প্রণাম করে বলি—'মাগো, অন্তত কোন রকমে পাশটা করিয়ে দিও। তা একবারও যদি ওনার দয়া হ'ত আমাদের ওপর ! প্রতি বছরই উনি আমাদের ঝুলিয়ে রাখেন আগেকার ক্লাশে। তাই আমরাও এবার ও'কে ঝুলিয়ে রাখলাম ঐভাবেই। উনি বুঝুন, ঝুলে থাকার কি মজা।'

ছোট মামার কাছ থেকে এসব শুনে নানা চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়েছিল পিংকু। কেমন যেন একটা খট্‌কা লেগেছিল ওর মনে। ঠাকুর কেন ছেলেগুলোকে বছর বছর ফেল করিয়ে দেন, তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছিল না পিংকুর। বেচারী ছেলেগুলোর কথা ভেবে সমবেদনায় ভরে উঠেছিল ওর অন্তর। যদিও মনে মনে ওদের ঐ কাজকে সমর্থন করতে পারেনি পিংকু, তবু সে সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করেছিল— ঠাকুর যেন ওদের ওপর অসন্তুষ্ট না হন। পরের বছর ওরা যেন ভালভাবেই পাশ করতে পারে। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল পিংকু। রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল ঘুমের ঘোরে ! সরস্বতী ঠাকুর ওর সামনে এসে বলছেন, 'পিংকু, শোন ! ওরা যে প্রতি বছর ফেল করে সে দোষটা ওদেরই। শুধু আমার পুজো করলেই তো পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। পাশ করতে হলে চাই মনের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। একাগ্র চিত্তে নিষ্ঠা সহকারে পড়াশুনা করলে তবেই পরীক্ষায় পাশ করা যায়। একথা বলেই সরস্বতী ঠাকুর অন্তর্ধান হলেন। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই পিংকু যখন ছোট মামাকে স্বপ্নের কথা সব খুলে বলেছিল, তখন ছোট মামা বলেছিলেন, ঠিকই তাই। যে নিজে চেষ্টা করে, ঈশ্বর তারই সহায় হন। পিংকুর কাছে ব্যাপারটা তখন আরও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। পিংকু মনে মনে ভেবেছিল, 'ঠাকুরযেন ঐ ছেলেগুলোকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে সব কথা জানিয়ে দেন।

একজোড়া পাতিহাঁস

এক গ্রামে একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরে ছিল একজোড়া রাজহাঁস। রাজহাঁস দুটো ছিল যেমনি ধবধবে সাদা, তেমনি বড়সড় এবং সুন্দর। জলের ওপর দিয়ে রাজহাঁস দুটো যখন ভেসে বেড়াত, তখন যে দেখত তারই চোখ জুড়িয়ে যেত। রাজহাঁস দুটোর ভেসে বেড়ানোর ভঙ্গিমার মধ্যে একটা আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠত।

একদিন সেই গ্রামের এক গরিব চাষী হাট থেকে একজোড়া পাতিহাঁস কিনে পুকুরটাতে ছেড়ে দিয়েছিল। পাতিহাঁস দুটো ছিল পাশের গ্রামের অন্য এক চাষীর। নিজেদের পাল ছেড়ে এসেছিল বলে পাতিহাঁস দুটোর খুবই মন খারাপ হয়েছিল। পুকুরের জলে ভাসতে ভাসতে ওদের কেবলই মনে পড়ত ফেলে আসা সঙ্গী-সাথীদের কথা।

পাতিহাঁস দুটোর মন খারাপ হয়েছিল আরও একটা কারণে। কারণটা হ'ল ঐ রাজহাঁস দুটো। পাতিহাঁস দুটোর একটার গায়ের রং ছিল মিশমিশে কালো, অন্যটা ছাই রং-এর। পুকুরের রাজহাঁস দুটো ওদের লম্বা লম্বা গলা উঁচু করে ডাকত আর রাজকীয় ভঙ্গিমায় ভেসে বেড়াত পুকুরের জলে। পাতিহাঁস দুটো তা দেখত এবং নিজেদের কালো-কুৎসিত চেহারার কথা ভেবে খুবই দুঃখ পেত মনে মনে।

ঐ পুকুরের ইঁট বাঁধানো ঘাটে গ্রামের লোকেরা বাসন মাজত, কাপড় কাচত, স্নানও করত। একদিন ঐ পাতিহাঁস দুটো একটা বউকে সাবান মেখে স্নান করতে দেখে মনে মনে ভাবল,—'আমরা যদি ঐ বউটার মত সাবান মেখে স্নান করতে পারতাম, তাহলে হয়তো আমরাও ঐ রাজহাঁস

দুটোর মতই ধবধবে সাদা ও সুন্দর হতে পারতাম। কিন্তু সে উপায় কোথায়!' তারপর এক সময় ওরা বলাবলি করল, 'নাই বা থাকল সাবান, ঠোঁট তো আছে। তাই দিয়েই আমরা চেষ্টা করে দেখি না, ফলটা কি দাঁড়ায়।'

এই ভেবে পাতিহাঁস দুটো প্রতিদিনই পুকুরের জলে গা ভিজিয়ে নিয়ে পুকুরের পাড়ে বসে বসে ঠোঁট দিয়ে কেবলই পালকগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করল। রাজহাঁসের মত ধবধবে সাদা হবার জন্য ওরা এতই উতলা হয়ে উঠল যে ঠিকমত গুগলি, শামুক পর্য্যন্ত খাওয়া বন্ধ করে দিল ওরা।

এদিকে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেছিল বলে পাতিহাঁস দুটো ক্রমেই রোগা হতে লাগল। ওদের ডিম দেওয়া বন্ধ হ'ল। ফলে, যে চাষীটা ওদের মালিক সে বিরক্ত হয়ে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিল ওদের। পাতিহাঁস দুটোকে কিনে নিয়ে এল ঐ রাজহাঁস দুটোর মালিক। রাত্রিবেলায় পাতিহাঁস দুটোকে রাজহাঁস দুটোর সঙ্গে একই ঘরে রাখা হল। রাজহাঁস দুটোর কাছ থেকেই ওরা জানতে পারল যে, পরদিনই ওদের জবাই করা হবে। শুনে পাতিহাঁস দুটো ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওদের মনে তখন আক্ষেপও হ'ল খুব। ওরা ভাবল, 'আমরা তো সুখেই ছিলাম চাষীর ঘরে। কেন মিছিমিছি যা হবার নয় তাই হতে চেয়েছিলাম। তাই না আজ আমাদের এই বিপত্তি।' সারা রাত ধরে এসব ভাবতে ভাবতে রাত ভোর হয়ে গেল।

পরদিন সকালবেলা রাজহাঁসের মালিক এসে জাল লাগানো কাঠের খুপড়ি ঘরটা খুলে দিতেই রাজহাঁস দুটো বেরিয়ে গেল। তারপর হেলে-দুলে হাঁটতে হাঁটতে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল পুকুরের দিকে। পাতিহাঁস দুটোর তখন বুক টিপ টিপ করছিল এক অজানা আশঙ্কায়। এমন সময় হঠাৎ ওরা শুনতে পেল একটা কথা। ওদের নতুন মালিকের ছেলেটা ওর বাবাকে আবদার করে বলছে, 'আব্বা, আমাদের রাজহাঁস দুটো তো ডিম দেয় না। কাল যে পাতিহাঁস দুটো কিনে এনেছ, ও

ছুটোকে তুমি মেরো না, আমি পুষব।' লোকটা প্রথমে আপত্তি করেছিল। কিন্তু ছেলেটা এমন জেদ ধরল যে শেষ পর্যন্ত লোকটা তা ফেলতে পারল না।

অগত্যা পাতিহাঁস দুটোকে জবাই না করে পুষবে বলেই ঠিক করল লোকটা। ওদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল পুকুরের জলে। পাতিহাঁস দুটোকে দেখে রাজহাঁস দুটো অবাক হয়ে গেল। পাতিহাঁস দুটো ওদের ভুল বুঝতে পেরেছিল আগেই। তাই রাজহাঁস দুটোর মত ধবধবে সাদা ও সুন্দর হবার চেষ্টা না করে পেটপুরে শামুক আর গুগলি খেতে আরম্ভ করল ওরা।

সেদিন রাত্রেই দুটো ডিম দিয়েছিল পাতিহাঁস দুটো। পরদিন সকালবেলা ডিম দেখে ওদের নতুন মালিকের ছেলেটা খুব খুশি হয়েছিল। পাতিহাঁস দুটোকে কোলে তুলে নিয়ে আদর ক'রে বলেছিল, 'ভারি সুন্দর এই হাঁস দুটো।' —একথা শুনে আনন্দে ভরে উঠেছিল পাতিহাঁস দুটোর মন।

বুবুনের বেড়ালছানা

বুবুনদের বাড়ির বেড়ালটা একসঙ্গে বেশ কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছিল। কোনটা সাদা, কোনটা মিশমিশে কালো, আবার কোনটা বা একহারা লাল, লাল-হলুদ কিংবা সাদা-কালো ডোরাকাটা। লাল-হলুদ ডোরাকাটা বেড়ালের বাচ্চাটাই বুবুনের খুব পছন্দ। একটু বড় হলে লাল-হলুদ রঙের বাচ্চাটাকে রেখে বুবুনের মা বাকিগুলো সবই পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দিয়েছিলেন।

বেড়ালছানাটা তখন বেশ একটু বড়ই হয়েছে। ধেড়ে বা নেংটি ইঁদুর ধরতে না পারলেও নিদেনপক্ষে টিকটিকি বা আরশোলা ধরতে সে বেশ পটু হয়েছে বলা যায়। সকালবেলা বেড়ালছানাটা ওর মায়ের কাছে শুয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে সকালের মিষ্টি রোদে লাফালাফিও করে এদিক সেদিক। কখনও কখনও আবার বুবুনের দাদা সন্তুর খেলার মার্বেল বা কাঁচের গুলি থাবা দিয়ে শিকার ধরার কায়দায় নাড়াচাড়াও করে অনেক সময় ধরে। মা-বেড়ালটাও কখনও কখনও শিকার ধরার কায়দা-কানুন হাতে-কলমে শিখিয়ে দেয় বাচ্চাটাকে, ঠিক যেমন করে শেখান বড় বড় ফুটবল দলের প্রশিক্ষকরা।

বেড়ালছানাটা বুবুনের ধ্যান-জ্ঞান হলেও সন্তুর ছিল দুচোখের বিষ। সে ওটাকে মোটেই সহ্য করতে পারত না। বুবুনকে ছানাটিকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে দেখলেই সন্তু একেবারে রি-রি করে উঠত। কোন কোনদিন পা লেপটে হাঁটার সময় সন্তু বেড়ালছানাটাকে ঘাড় ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিত তিতি-বিরক্ত হয়ে। এই নিয়ে ভাই-বোনে লেগে যেত তুমুল

ঝগড়া। তখন মা নিতেন সন্তুর পক্ষ এবং বাবা আগলাতেন বুবুনকে। মা অবশ্য বুবুনকে আগলানোর ব্যাপারটাকে ওর বাবার আদিখ্যেতা দেখানো বলেই মন্তব্য করতেন রাগে গজ গজ করতে করতে।

সন্তুর মতই বুবুনের মা-ও বেড়ালছানাটাকে একদম সহ্য করতে পারতেন না। ভাদ্র মাসে বুবুনের যখন প্রচণ্ড পেট খারাপ করেছিল, তখন ওর মা-তো বলেই বসেছিলেন যে, ঐ অলক্ষুণে বেড়ালছানাটাই যত নষ্টের গোড়া। বেড়ালের লোম পেটে গেলে পেটের অসুখ না হয়ে পারে? পেটের অসুখ তো দূরের কথা, ডিপথেরিয়া যে হয়নি তাই আশ্চর্য! বুবুনের বাবার মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। প্রফেসার মানুষ। এসব ঠুনকো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোটা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বেড়ালছানাটাকে তিনি অপছন্দ করতেন না। 'যত্র জীব, তত্র শিব'— তিনি ছিলেন এই মতবাদে বিশ্বাসী। অতএব বুবুনের মায়ের বিরোধিতা এবং ওর বাবার আনুকূল্যের মধ্য দিয়েই বেড়ালছানাটা ক্রমে বড় হতে লাগল।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল একটা ঘটনা। একদিন দেখা গেল বেড়াল-ছানাটা একটা মাঝারি আকারের ইঁদুর ধরে এনেছে। সুন্দরবনের মানুষ-খেকো বাঘ যেমন করে মধু সংগ্রহকারী লোকেদের মুখে করে তুলে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই বুবুনের মা মনে মনে সন্তুষ্ট হলেন। এরপর সন্তুও খুশি হয়েছিল বেড়ালছানাটার উপর। তবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। সন্তুর ছিল প্রচণ্ড বল খেলার বাতিক। খেলার কাগজ পড়া, টি ভি-তে খেলা দেখা থেকে শুরু করে ফুটবলের সব হদিশ সে রাখত। কলকাতার বড় বড় দলগুলো তো বটেই, এমন কি ব্রাজিল, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ফুটবলের খবরাখবর ছিল ওর নখদর্পণে। সন্তু নিজেও ভবিষ্যতে একজন বড় মাপের খেলোয়াড় হতে ইচ্ছুক। মারাদোনা না হোক, অন্ততঃ চিমা বা জামশিদের মত একজন হবার ইচ্ছে তার প্রবল।

একদিন দুপুরবেলা সন্তু রোয়াকে বসে খেলার কথাই ভাবছিল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, বেড়ালছানাটা একটা রবারের বলকে নিয়ে থাবা দিয়ে বেশ দ্রুত এদিক-সেদিক নাড়াচাড়া করছে। বেড়ালছানাটার বল ট্যাক্‌লিং দেখে সন্তু মুগ্ধ হয়ে গেল। এর পর থেকে সন্তু ওকে খুবই আদর করত এবং সময় পেলেই ওর সামনে কাঁচের গুলি কিংবা রবারের বল ছুঁড়ে দিয়ে ওর বল ট্যাকলিং করার কায়দাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত। সন্তুর তন্ময় দৃষ্টিতে বেড়ালছানাটা ক্রমে হয়ে উঠত কোন এক ডাকসাইটে 'সেণ্টার ফরোয়ার্ড'।

এদিকে সন্তুর নিজস্ব অনুশীলনও চলতে লাগল সমান তালে। সযত্ন অনুশীলন, শ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে সন্তু অচিরেই ওদের ক্লাবের একজন নির্ভরযোগ্য 'স্ট্রাইকার' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। সে বছর সন্তুদের দলই জোন-এর ফাইনাল খেলায় জিতেছিল। একমাত্র গোলটাও দিয়েছিল সন্তুই। বুবুনের বেড়ালছানাটার মতই ঘাপটি মেরে ছিল সে। তারপর বল পেতেই গোত্তা মেরে কোমরের ঝাঁকুনীতে প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বলটাকে সে জালে ঠেলে দিয়েছিল। মনের খুশীতে ভরপুর সন্তু সেদিন একজোড়া ইলিশ কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। সন্তুর এই কৃতিত্বে বাড়ির সবাই খুশী। বুবুনের বেড়ালছানাটাও কয়েকবার এগিয়ে এসে 'মিউ মিউ' করে ডেকেছিল। তবে সেটা সন্তুর কৃতিত্বের জন্য ওর আনন্দের অভিব্যক্তি অথবা ইলিশ ভাজার স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ, তা বোঝা যায় নি।

সনাতনের সুখ-শান্তি

অনেকদিন আগেকার কথা। রাণাঘাট শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রামে বাস করত সনাতন নামে এক গরীব দিনমজুর। সে দিন এনে দিন খায়। কোনদিন কোন কারণে মহাজনের আড়তে কাজ করতে না গেলে সেদিন তাকে ছেলেপুলে নিয়ে উপোষ থাকতে হয়! তখন অবশ্য এখনকার মত জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম ছিল না। তবু, গরীব মানুষের সুদিন এখন যেমন নেই, তেমনি তখনও ছিল না। গরীব হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সনাতনের মনোবল ছিল অটুট! অটুট মনোবল নিয়েই সে অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য কেমন যেন মুষড়ে পড়ত সে। তখন নৈরাশ্যের একটা কালো ছায়া নেমে আসত সনাতনের অন্তরে, এই ভেবে যে—যদি ওর ছেলেরা মানুষ না হয়।

সনাতনের তিন ছেলে। ছেলেরা তখন সবাই নাবালক। এই নাবালক ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যেও একটা সুখের অনুভূতি এবং আশার আলো জেগে উঠত সনাতনের অন্তরে। সনাতন নিজে লেখাপড়া জানত না। সে যখন খুবই ছোট, তখন তার বাবা মারা যায়। তাই পড়াশুনার সুযোগ সে পায়নি। এ জন্য সনাতনের অন্তরে আক্ষেপের অন্ত ছিল না। তবু সে মনে মনে সান্ত্বনা পেত এই ভেবে যে, সে তার ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলবে। তার অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, সে যদি ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে পারে তবে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সংসারে সুদিন ফিরে আসবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় অন্য। সনাতনের ভাগ্যেও তাই-ই হলো। সনাতনের ছেলেদের বয়স যতই

বাড়তে লাগল, ততই তারা হয়ে উঠল দুরন্ত, ডানপিটে এবং উচ্ছৃঙ্খল। লেখাপড়ায় তাদের মন নেই। সনাতন কাজে বেরিয়ে যেতেই তারা যে যার মত বেরিয়ে পড়ে এদিক সেদিক। এমনিভাবে ক্রমে ক্রমে সঙ্গ-দোষে সনাতনের ছেলেরা হয়ে উঠল এক একটা কালা পাহাড়। সনাতন নানাভাবে ছেলেদের বোঝাতে চেষ্টা করল তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অনতিকাল মধ্যেই সনাতনের সংসারে দেখা দিল অশান্তি। এতকাল দুঃখ-কষ্ট ছিল সনাতনের সংসারে নিত্যসাথী। এবারে সংযোজিত হল অশান্তি। এদিকে ক্রমাগত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় সনাতনের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। সে আর আগের মত পরিশ্রম করতে পারে না। স্বাস্থ্যের কারণে মাঝে মাঝেই তার কাজ কামাই হতে লাগল।

একদিন সনাতন মহাজনের আড়তে কাজ করে দিনান্তে বাড়ি ফিরেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। সনাতনের স্ত্রী ডাক্তার ডেকে আনল। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় সনাতনের অবস্থার তেমন উন্নতি হল না। অন্তরে একরাশ অবসাদ ও দুঃখ নিয়ে সে যেন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। এদিকে গরীবের সংসারে একমাত্র উপার্জনশীল লোকের কাজ না থাকলে যা ঘটে সনাতনের সংসারেও তেমনি বিপর্যয় দেখা দিল। পাড়া-প্রতি-বেশীদের সাহায্যে দিন কতক কোন রকমে কাটল বটে, কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলে? অবশেষে একদিন সনাতনের স্ত্রীর পরামর্শে বড় ছেলে কালীচরণ গিয়ে উপস্থিত হ'ল মহাজন অভয়বাবুর বাড়ি; যদি একটা কাজের সংস্থান হয় সেই প্রত্যাশায়।

শহরের একান্তে চূর্ণী নদীর ধারে বিরাট এলাকা নিয়ে অভয়বাবুর বাড়ি। বাড়ির সামনে প্রশস্ত ফুলের বাগান। মাঝখানে জলের ফোয়ারা। চারিদিকে রকমারি মৌসুমী ফুলের সমারোহ। বাগানের একপাশ দিয়ে ছোট ছোট নুড়ি-বিছানো পথ বেয়ে বিশাল বাড়িটার বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হয় কালীচরণ। কালীচরণকে দেখেই বারান্দার অপর প্রান্তে শিকলে বাঁধা অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা তারস্বরে চিৎকার

করতে থাকে। কুকুরের চিৎকার ও আস্ফালনে কালীচরণ তখন রীতিমত ভীত-সন্ত্রস্ত। এমনি যখন কালীচরণের অবস্থা, ঠিক তখনই সম্ভবত কুকুরের চিৎকার শুনে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন অভয়বাবু। কুকুরটা তখনও এক নাগাড়ে ডাকতেই থাকে। কিন্তু আশ্চর্য! অভয়বাবু কুকুরটার দিকে তাকিয়ে হাতে তুড়ি দিতেই কুকুরটা এক মুহূর্তে একেবারে চুপ হয়ে গেল। এরপর অভয়বাবু কালীচরণের সব কথা শোনেন এবং তাকে আড়তে কাজ দেবেন বলে ভরসা দেন।

অভয়বাবুর বাড়ি থেকে খুশি মনে বেরিয়ে আসে কালীচরণ। তার মনে তখন একরাশ বিস্ময় ও ভাবনা। মানুষ যে জীবনে এতটা উন্নতি করতে পারে, এত বড় হতে পারে, তা ছিল তার ধারণার অতীত। অভয়বাবুর এতটা উন্নতি কীভাবে সম্ভব হয়েছে, তাই নিয়ে ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে কালীচরণ। কিন্তু ভেবে কোনই কুল-কিনারা খুঁজে পায় না সে। সেদিন রাত্রিবেলা ঘুমের ঘোরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে কালীচরণ। কালীচরণ আড়তে কাজ করছে, সেই সময় সেখানে গিয়ে হাজির হয় ওর বাবা সনাতন। কালীচরণ স্পষ্ট শুনতে পায় সনাতন তাকে বলছে—'শোন কালীচরণ, অভয়বাবু কেন এতটা উন্নতি করেছেন এবং বড় হয়েছেন জান?—তার কারণ, মানুষ তো দূরের কথা, তাঁর বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত তাঁর কথা শোনে।' স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভেঙ্গে যায় কালীচরণের। একটা অব্যক্ত কান্নায় ওর বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে। সে মনে মনে আক্ষেপ করে এই ভেবে যে, কেন ওরা এতদিন বাবার কথা শোনেনি। তা যদি ওরা সবাই শুনত, তবেই নিশ্চয়ই ওদের সংসারের এই পরিণতি হ'তনা…।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কালীচরণ ছুটে যায় সনাতনের কাছে। অসুস্থ সনাতনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কালীচরণ বলে, 'বাবা, আজ থেকে আমরা সবাই তোমার কথামত চলব, তুমি যা বলবে, তাই করব।' ছেলের কথায় পরিতৃপ্ত হয় সনাতন। ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠে সে। তার সংসারে সুখ ও শান্তি ফিরে আসে অচিরেই।

বড় মামার ভূত নাচানোর গল্প

গত বছর পূজোর সময় নৈনিতাল থেকে বেড়াতে এসেছিলেন টিংকুর বড়মামা। টিংকুর মা প্রায়ই বলতেন যে টিংকুর বড়মামা নাকি ভূতের গল্প বলার একেবারে মাষ্টার লোক। শুনে অবধি টিংকু, বাচ্চু ও মিন্নু ওরা তিন ভাইবোন তক্কে তক্কে ছিল কবে ওদের বড়মামা আসবেন আর ওরা ভূতের গল্প শুনবে। তাই বড়মামা বেড়াতে আসায় ওদের আর আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। বড়মামা দিলদরিয়া লোক, দু'হাতে পয়সা খরচ করেন। মায়ের কাছে টিংকু ওরা শুনেছিল যে ভারতবর্ষের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে বড়মামা বেড়াতে যান নি। কাজেই ভারতবর্ষের কোথায় কি আছে না আছে, তা নাকি বড়মামার নখদর্পণে। টিংকুর মা আরও বলেছিলেন যে, বহুদর্শী বলেই নাকি বড়মামা এত গল্প জানেন। এ হেন বড়মামাকে পেয়ে টিংকু, বাচ্চু, মিন্নু তাঁকে একেবারে ছেঁকে ধরল ভূতের গল্প শুনবে বলে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বড়মামাকে মাঝখানে বসিয়ে গল্প শুনতে বসল টিংকু, বাচ্চু ও মিন্নু। বড়মামা গল্প শুরু করার আগেই একটা সর্ত আরোপ করলেন। বড়মামা বললেন, 'দেখ টিংকু, বাচ্চু, মিন্নু, আমি যখন গল্প বলা শুরু করব, তখন কিন্তু তোমাদের মাঝে মাঝে 'হুঁ-হুঁ' করতে হবে। কারণ, ভূতের গল্প তা না হ'লে তেমন জমাটি হয়ে ওঠে না।' বড়মামার আরোপিত শর্ত একবাক্যে মেনে নিল টিংকু, বাচ্চু ও মিন্নু। শুরু হলো বড়মামার গল্প।

—'অনেকদিন আগে আমি একবার শিলিগুড়ি থেকে আসাম

যাচ্ছিলাম কামরূপ এক্সপ্রেস ট্রেনে। তখন শীতকাল। প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীত পড়েছিল সেদিন। একে প্রচণ্ড শীত, তার উপর শেষ-রাতের ট্রেন, তাই ট্রেনে প্যাসেঞ্জার তেমন ছিল না। ট্রেনে উঠেই দেখলাম দু'পাশে বাঙ্কের উপর দু'জন লোক সটান কম্বল মুরি দিয়ে শুয়ে আছে। দু'জনের একই রকমের কম্বল। গাড়িতে একটিমাত্র বাল্ব জ্বলছিল। আবছা আলো। কিন্তু সেই আবছা আলোতেই আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, ঐ দু'টো লোকই অস্বাভাবিক লম্বা। প্রত্যেকের উচ্চতা কমপক্ষে সাত ফুট বা সাড়ে সাত ফুটের কম হবে না। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যে, ওরা দু'জনেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু সেই নাক ডাকানটা ছিল বিকট। মনে হচ্ছিল, যেন দূরে কোথাও মেঘ ডাকছে। কান পেতে খুব ভালভাবে না শুনলে বোঝার উপায় ছিল না যে, ওদের দু'জনেরই ঐ ভাবে একই সঙ্গে একতালে নাক ডাকছে।' —এই পর্যন্ত বলেই বড়মামা থামলেন। একবার বললেন, 'কি তোমরা মাঝে মাঝে হুঁ—হুঁ করছ না তো?'

টিংকু, বাচ্চু ও মিনু একসঙ্গে বলে উঠল, 'হুঁ'। বড়মামা একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে জোরে টান মারলেন। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন কোন অবধি বলে তিনি বলা বন্ধ করেছিলেন। বড়মামা বলে চললেন, 'রাতের কুয়াশা ভেদ করে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন। চলছে তো চলছেই। আমি যে কম্পার্টমেণ্টে উঠেছিলাম তাতে সবশুদ্ধ জনা কুড়ি প্যাসেঞ্জার ছিল। সবাই তখন ঘুমে অচেতন। একা আমিই তখনও জেগে। জেগে এইজন্য যে, তখন আমার ঘুমই আসছিল না বাঙ্কের উপরকার ঐ দুই আরোহী কারা সেই রহস্য উদ্ঘাটন করার তাগিদে। কিন্তু আশ্চর্য! হঠাৎ উপরে তাকিয়ে দেখি, ওরা দু'জনের কেউই সেখানে নেই। দু'টো বাঙ্কই একেবারে ফাঁকা। অথচ গাড়ি কিন্তু মাঝখানে কোথাও থামেনি। তখন আমার বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল না যে, ওরা অশরীরী, ভূত।

বড়মামা এই পর্যন্ত বলা শেষ করতেই মিনু আস্তে আস্তে এসে একেবারে বড়মামার কোল ঘেসে বসল। বাচ্চু চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল। ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। কেবলমাত্র ডানপিটে টিংকুটা কোনক্রমে ঢোক গিলে নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুটা ভাঙ্গা গলায় ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'হুঁ—তারপর!'

বড়মামা শুরু করলেন—'তারপর আর কি?' ভূতের ভয় তো আমার নেই! কিন্তু আমার মনে তখন অন্য চিন্তা। ভূত দু'টো ঐভাবে মানুষের সাজে গাড়িতে উঠল কোত্থেকে আর নামলই বা ঠিক কোথায়! উঠেছিল কোথায় তা আমি দেখিনি অবশ্য, কিন্তু নামল তো ধরতে গেলে আমার নাকের ডগার উপর দিয়ে। আমার আফশোষ হ'ল। কেননা, আমার দাদুর যিনি দাদু, তাঁর যিনি দাদু, তিনি যে মন্ত্রটা বংশানুক্রমে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, আগে যদি বুঝতাম ভূত দু'টো পালিয়ে যাবে তাহলে সেই মন্ত্রবলে ওরা কতবড় ভূত তা ওদের বুঝিয়ে দিতাম।

এই সময়ে সাহস করে বাচ্চু বলল, 'বড়মামা, তুমি ভূতের মন্ত্রও জান নাকি? ঐ মন্ত্র দিয়ে তুমি ওদের কি করতে?' টিংকু বলল, 'বড়মামা, তুমি ভূতের ওঝা নাকি?' বাচ্চু ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তারপর সেই ভূত দু'টোর কি হ'ল জানতে চাইল। বড়মামা বললেন, 'তা বলতে পারব না। কারণ, ওরা তো তখন আমার নাগালের বাইরে। তবে হ্যাঁ, ওরা ঐভাবে পালিয়ে যাবে এ কথা যদি আমি আগে বুঝতাম, তাহলে বাছাধনেরা টের পেত কত ধানে কত চাল।'

এই সময়ে মিনু ও বাচ্চু প্রায় একই সঙ্গে জানতে চাইল বড়মামা তাহ'লে কি করতেন সেই কথা। একটু থেমে বড়মামা বললেন, 'শোন তাহ'লে বলি। ভূত-ভাগানোর যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি ভূত আটকানোরও একটা মন্ত্র আছে। দাদু বেঁচে থাকতে মন্ত্রগুলো তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন। কোন এক নাগা সন্ন্যাসীর কাছ থেকে আমার দাদুর যিনি দাদু, তাঁর যিনি দাদু, তিনিই মন্ত্রগুলো শিখেছিলেন। ভূত আটক করার

মন্ত্রটার নাম 'ভূত-বন্দী' মন্ত্র। ভূত একবার চোখে পড়লে এই মন্ত্রটা উচ্চারণ করা মাত্র বাছাধনের আর পালাবার জো থাকে না। যতক্ষণ খুশী, যতদিন খুশী ইচ্ছেমত তাকে আটকে রাখা যায়। তবে ভূতকে আটকে রাখার আবার একটা অসুবিধেও আছে। ভূতকে সব সময়ে কোন না কোন কাজ দিতে হয়। কোন কাজ না করে ওরা থাকতে পারে না। এ জন্যেই লোকে বলে যে, অমুক লোকটা ভূতের মত খাটতে পারে! বুঝেছ তো ব্যাপারটা?'

বড়মামার প্রশ্নের পাল্টা প্রশ্ন করল টিংকু। সে বলল, 'আচ্ছা বড়-মামা, তাই যদি হয় তাহ'লে ঐ ভূত দু'টো বাক্সের উপর ঘুমাচ্ছিল কি ক'রে? ঘুমানটা তো আর কাজ নয়!' বড়মামা বললেন, 'সেই কথাই তো বলব এখন। মন দিয়ে শোন। আমার যতদূর মনে হচ্ছে ঐ ভূত দু'টো কোন জাঁদরেল ওঝার কাছে বন্দী ছিল এতকাল। ওদের তো অলৌকিক শক্তি। হয়তো ওঝাটাকে কাবু ক'রে পালিয়ে এসেছে কোনমতে। ওঝার নাগালের বাইরে চলে এসেছিল বলেই ওরা ঐভাবে ঘুমাতে পারছিল। বছর কয়েক আগে দেরাদুনে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। বলি শোন।

'দেরাদুনের ওঝাটা ছিল খুব বড় দরের। ভূতেরা ওর কাছে ঘেঁসতেই পারত না। তিব্বত থেকে আসা দু'টো ভূতকে সে 'ভূত-বন্দী' মন্ত্র জপ ক'রে আটক করেছিল। ভূত দু'টোর ছিল পেল্লাই চেহারা। কিন্তু আটক করার পর ওঝাটা পড়েছিল মহা ফাঁপরে। ভূত দু'টোকে সব সময় একটা না একটা কাজ দিতে হ'ত। কিন্তু কাজ আর কত দেবে সে! অগত্যা সেই ওঝা পেল্লাই চেহারার ভূত দু'টোকে সাত-সাতটা বছর ধরে অনবরত নাচিয়েছিল। তারপর মন্ত্র পড়তে যেই না একবার ভুল ক'রেছে ওঝাটি, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ওঝাটার ঘাড়টি চেপে ধরে মটকে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ভূত দু'টো।'

বড়মামার কথা শেষ হতে না হতেই টিংকু তার ভ্রূ-কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'মামা, সাত বছর ধরে ভূত নাচিয়েছিল কি ভাবে? তা কিভাবে

সম্ভব?' বড়মামা বললেন, 'শোন, সেই কথাটাই তো বলব এখন।' ভূত নিয়ে যারা কারবার করে তাদের ঝাড়-ফুঁক, গুণ-মন্ত্র, নানা রকম আঁকি-বুকি ইত্যাদি অনেক কিছুই জানতে হয়। ঐ ওঝাটাও সে সবই জানত। আমরাও তো জানি যে ভূতকে জব্দ করার একটা জব্বর উপায় হ'ল 'রাম নাম' জপ করা। 'রাম নাম' জপ কবলে ভূত আর কাছে পিঠে কোথাও থাকতে পারে না। ভূতের ভয় পেলেই লোকে তাই মনে মনে রাম নাম জপ করে। এ্যালজেবরার ফরমূলার মতই ভূত-প্রেতের সমস্যা সমাধানেরও নানা রকম ফরমূলা আছে। মাথা খাটিয়ে, বুদ্ধি খরচ ক'রে সে সব ফরমূলা উদ্ভাবন করতে হয়, সে গুলোকে ঠিক ঠিক মত কাজে লাগাতে হয়। ঐ দেরাদুনের ওঝাটিও তাই-ই করেছিল, তার বেশী কিছু নয়। বুদ্ধি খরচ ক'রেই ওঝাটা ঐ ভূত দু'টোকে সাত-সাতটি বছর ধরে লাগাতার নাচিয়েছিল। লোকটি তার 'আয়ারাম-গয়ারাম' মন্ত্রটি উচ্চারণ করেই এই কাণ্ডটা করেছিল। অবশ্য যে কেউই এটা করতে পারে না, আর করলেও তাতে কোন কাজ হবে না। মন্ত্রটাকে আগে থেকে শোধন করে নিতে হয়। এই শোধন করা মন্ত্রটা চোখ বুজে অনবরত উচ্চারণ করতে হয়েছিল ওঝাটাকে। যেই সে বলত, 'আয়ারাম', অমনি 'রাম এসে গেছে' ভেবে নিয়ে ভূত দু'টো ভয় পেয়ে বেশ খানিকটা তফাৎ হঠে যেত। আবার যেই সে বলত, 'গয়ারাম', অমনি 'রাম চলে গিয়েছে', মনে করে নিয়ে ভূত দু'টো রেগে-মেগে ছুটে আসত ওঝাটাকে আক্রমণ করতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ওঝাটা আবার বলে উঠত, 'আয়ারাম'। এমনি ভাবে অনবরত 'আয়ারাম' আর 'গয়ারাম' মন্ত্র উচ্চারণ করে করে সাত-সাতটা বছর সে নাচিয়েছিল ভূত দু'টোকে। তারপর একদিন যেই না ওঝাটা ভুলক্রমে পর পর দু'বার একই সঙ্গে বলে ফেলেছে 'গয়ারাম', 'গয়ারাম' আর যাবে কোথায়! অমনি সেই ভূত দু'টো ওঝাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।' এই পর্যন্ত বলতে বলতেই টিংকুর মা এসে সবাইকে খেতে ডাকলেন।

টিংকু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড়মামার কাছে জানতে চাইল,—

'বড়মামা, এত সব খবর তুমি কোথায় কিভাবে পেলে ?' বড়মামা বললেন, 'সেইটাই তো কথা। বলছি তাহ'লে শোন। ভূতের ওঝাদের অল ইণ্ডিয়া কন্‌ফারেন্স হয় প্রতি বছর শীতকালে, সিমলাতে। ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ওঝা আসে সেখানে। সেখানে আমিও যাই কিনা, তাই জানতে পারি এসব।' তখন টিংকু, বাচ্চু ও মিন্নু তিনজনই বড়মামার কাছে আবদার করল ওদের ভূত ভাগানো মন্ত্রটা অন্ততঃ শিখিয়ে দিতে। বড়মামা বললেন, 'ভূত-ভাগানো' মন্ত্র শেখানটা কোন একটা ব্যাপার নয়। তবে সে সব এখন নয়। আগে তোমাদের পৈতে হোক তারপর। কারণ, পৈতের আগে গায়ত্রী মন্ত্র না নিয়ে অন্য মন্ত্রে কোন ফল হয়না।' তারপর মিন্নুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মেয়েদের ভূতের মন্ত্র শেখা এবং শেখানো—দু'টোই শাস্ত্র বিরুদ্ধ।'

লাস্ট কম্পার্টমেণ্টের যাত্রী

কলকাতার একটা সওদাগরী অফিসে টাইপিস্টের চাকুরী করে শুভময়। রাণাঘাটের নতুনপাড়ায় ওদের বাড়ি। প্রগতিশীল, স্মার্ট এবং প্রাণবন্ত এই ছেলেটি যে কম্পার্টমেণ্টে উঠে প্রতিদিন রাণাঘাট থেকে কলকাতা যায়, সেই কম্পার্টমেণ্টটাকে সে একবারে মাতিয়ে রাখে। চারটে বেয়াল্লিশের ডাউন কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেনটা ধরে তাকে যেতে হয় কলকাতায়। শুভময় রাণাঘাট থেকে উঠবে, সেজন্য বাদকুল্লা, বীরনগর এবং কালীনারায়ণপুর থেকে ওর সহযাত্রী বন্ধুরা ওর জন্য জায়গা রেখে দেয় আগে থেকেই। এজন্য বসার জায়গার ভাবনা ওর থাকে না কোনদিনই।

ভোর চারটে বেয়াল্লিশের ট্রেন। কাজেই ট্রেনের বৈদ্যুতিক বাল্বগুলো জ্বলতে থাকে রাণাঘাট থেকে কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর বা নৈহাটী পর্যন্ত। মাস ছ'য়েক হ'ল শুভময়ের চাকুরী হয়েছে কলকাতার ডালহৌসী এলাকায়। এই ছ'মাস ধরেই সে একটা জিনিস লক্ষ্য করে আসছিল যে, যে কম্পার্টমেণ্টে উঠে সে প্রতিদিন কলকাতা যায়, গাড়ির সেই লাস্ট কম্পার্টমেণ্টটায় একজোড়া লোক প্রতিদিন একদম শেষের দিকের বেঞ্চটার এক কোনে বসে কালো চাদরে শরীরটাকে ঢেকে, হাঁটুর মধ্যে মুখটাকে গুঁজে দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে যায়। এই ক'মাসের মধ্যে একটা দিনও শুভময় ওদের মুখ দেখতে পায়নি। মাঝে মাঝে অবশ্য ওরা হাঁটুতে গুঁজে রাখা মুখটা এক আধবার তুলতো। কিন্তু তবু মুখটা নিচের থুতনীর দিক থেকে নাক অবধি এমনভাবে ঢাকা থাকতো যে, বড় বড় লালচে চোখগুলো ছাড়া আর কিছুই ভালভাবে দেখা যেতনা। শুভময়ের বন্ধুরাও কেউ জানতো না লোক দু'টো ঠিক কোন্ ষ্টেশন থেকে

গাড়িতে উঠে। অরবিন্দ নামে যে ছেলেটি বাদকুল্লা থেকে ট্রেন ধরে, সে নাকি গাড়িতে উঠে প্রতিদিনই ওদের দেখতে পায় ঐভাবে বসে থাকতে। কাজেই শুভময় বা ওর সহযাত্রী বন্ধুদের এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ওরা নিশ্চয়ই লাস্ট ষ্টেশন কৃষ্ণনগর থেকেই গাড়িতে উঠে। লোক দু'টো সম্পর্কে এর বেশী কিছু জানা শুভময় বা ওর সহযাত্রী বন্ধুদের সম্ভব হয়নি। ওদের সম্পর্কে শুভময়দের কৌতূহল যে একেবারেই ছিল না তা নয়। কিন্তু এমন কোন সুযোগ হয়নি যে ওরা ওদের পরিচয় জানবে। ট্রেন যখন শিয়ালদহ গিয়ে পৌঁছায় তখন শুভময়, অরবিন্দ ওরা সবাই তাড়াতাড়ি ট্রাম বাস ধরবে বলে নেমেই ছুটতে থাকে। কাজেই শেষ পর্যন্ত লোক দু'টো শিয়ালদহে নামে কিনা তা দেখাও ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ ভাবেই চলছিল শুভময়ের কলকাতা যাওয়ার পর্বটা। একদিন হঠাৎ রাণাঘাটে ট্রেনে উঠেই শুভময় দেখল যে, অন্যদিনের মত ঐ লোক দু'টো যথাস্থানে বসে নেই। ব্যাপারটা শুভময় বা ওর সহযাত্রী বন্ধুদের কারও দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু ওরা সবাই খুব অবাক হলো, যখন দেখা গেল যে, লোক দু'টো পর পর দু'সপ্তাহ আর আসছে না। প্রথম প্রথম শুভময় ওরা ভেবেছিল যে, হয়তো অসুখ-বিসুখের জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে ওরা আর আসছে না। কিন্তু দু'সপ্তাহ পরেও যখন ওরা আর এলো না, তখন ওদের মনে নানা রকম সন্দেহ দেখা দিল। কেউ বলল, 'কি জানি, হয়তো গোয়েন্দা দপ্তরের লোকটোক হতে পারে।' কেউ বলল, 'স্মাগলার'। অরবিন্দ তো সোজাসুজি বলেই বসল যে, ওরা মানুষ নয়, একজোড়া ভূত। অরবিন্দের কথা শুনে সংস্কার মুক্ত শুভময় হো হো করে বেশ একচোট হেসেছিল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল! এ নিয়ে আর কোনদিন ওরা কেউই মাথা ঘামায়নি বড় একটা।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। সেদিন ছিল শুভময়ের অফিসের ছুটির দিন। তাই সে গিয়েছিল বনগাঁয় ওর দিদির

বাড়ি বেড়াতে। সেদিন বিকেলেই শুভময়ের ফিরে আসার কথা। কিন্তু অনেকদিন দিদির বাড়ি যায়নি সে। তাই দিদি যখন ওকে রাতটা থেকে যেতে বলেছিলেন, তখন তাঁর কথাটা ফেলতে পারেনি সে। পরদিনও ছিল শুভময়ের ছুটির দিন। তবু অন্য কাজ রয়েছে। তাই শেষ রাত্রে উঠেই শুভময় বনগাঁ থেকে রাণাঘাটগামী ফার্স্ট লোকালটা ধরেছিল। শুভময় ষ্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। আর একটু হলেই ওকে ট্রেন ফেল করতে হতো। সে ছুটতে ছুটতে এসে কোনক্রমে চলন্ত ট্রেনটার লাস্ট কম্পার্টমেণ্টে উঠেছিল। সে সময় একটা দীর্ঘকায় লোক কম্পার্টমেণ্টের ভেতর থেকে ওকে হাত ধরে টেনে তুলেছিল। অনভ্যস্ত পায়ে অনেকটা পথ ছুটে এসেছিল বলে ট্রেনে উঠে রীতিমত হাঁফাচ্ছিল শুভময়। খানিকটা সময় রিং ধরে দাঁড়িয়ে থেকে সে এগিয়ে গেল ভেতরের দিকে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসতে। ঠিক তখনই তার নজর পড়লো একেবারে শেষের বেঞ্চটার দিকে। সেদিকে তাকাতেই শুভময়ের চক্ষু একেবারে স্থির হয়ে গেল। সে আশ্চর্য্য হয়ে দেখল যে, কৃষ্ণনগর ট্রেন থেকে সেই হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া লোক দু'টো একইভাবে বেঞ্চের এককোণে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। ভয়ের একটা শীতল স্রোত মুহূর্তে বয়ে গেল শুভময়ের শিরা-উপশিরায়ঃ ওর স্পষ্ট মনে হলো যে, ওদেরই একজন একটু আগে ওকে হাত ধরে টেনে তুলেছে ট্রেনে এবং তারপরই আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল ঐ বেঞ্চটার দিকে। তখন অবশ্য শুভময় ততটা খেয়াল করেনি, কিন্তু এখন তার সবই মনে পড়ছে একে একে। লোকটার হাত দু'টো ছিল বরফের মত ঠাণ্ডা এবং সাঁড়াশীর মতই শক্ত। সেই শক্ত হাতের চাপে শুভময়ের হাতের কব্জিটাই যেন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

কম্পার্টমেণ্টে প্যাসেঞ্জার ছিল খুবই কম। তাই কেমন যেন ভয় ভয় করছিল শুভময়ের। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক সময় ওর মনে পড়লো বাদকুল্লার অরবিন্দের কথা। তবে কি ওরা মানুষ নয়, ভূত? কিন্তু তাই যদি হয় তবে ওরা এভাবে শেষ রাতের ট্রেনে কখনও

কৃষ্ণনগর থেকে শিয়ালদহ আবার কখনও বনগাঁ থেকে রাণাঘাট ঘুরে বেড়ায় কেন ? একটা কথা ভেবে শুভময় কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল। ওরা ভূতই হোক আর যাই হোক, নিশ্চয়ই শুভময়ের অশুভ ওরা কিছু করবে না। কেন না, তা যদি করতো তা'হলে ওকে নিশ্চয়ই হাত ধরে টেনে তুলতো না ওদেরই একজন।

তবু কেন যেন কোন এক অজ্ঞাত কারণে শুভময়ের বিশ্বাসী মন কিছুটা অবিশ্বাসী হয়ে উঠে। সে মনে মনে রাম নাম জপতে থাকে। এক সময় ট্রেন এসে থামে রাণাঘাট ষ্টেশনে। তখনও ভোর হয়নি। প্রায় জনহীন রাণাঘাট ষ্টেশন আলোয় ঝলমল করছে। এতক্ষণে ভয় কিছুটা কেটে গেছে শুভময়ের। ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই সে চট্‌পট্ নেমে পড়ে। তারপর খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। শুভময়ের কৌতূহলী মন জানতে চায় ওরা কারা। যথাসময়ে ট্রেন থেকে নেমে আসে ওরা। ওদের মাথায় যেন কিসের দু'টো বোঝা। কুয়াশায় ভাল করে বুঝতে পারে না শুভময়। মাথায় বোঝা নিয়ে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে ওদেরই একজন শুভময়কে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'হেই বাবু, আজ কলকাত্তা নেহী জায়েঙ্গে কেয়া ?' শুভময়ের কিছু বলার আগেই ওরা হন্ হন্ করে ছুটে গিয়েছিল পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমের দিকে কলকাতার ট্রেন ধরতে। শুভময় স্পষ্ট দেখেছিল ওদের মাথায় নিমের ডালের বোঝা। শুভময় জানে ডালহৌসীতে এবং কলকাতার অন্যত্রও এগুলো বিক্রি হয় দাঁতন হিসেবে।

পরদিন ভোর চারটে বেয়াল্লিশের কৃষ্ণনগর ডাউন ট্রেনে বসে অরবিন্দ, নীতিশ ওদের কাছে শুভময় যখন সব ঘটনা খুলে বলেছিল, তখন তা শুনে ওদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। হাসি থামলে অরবিন্দ শুভময়কে লক্ষ্য করে একবার অবশ্য বলেছিল, 'কাওয়ার্ড'।

একটি বেগুন গাছ

শিউলিদের বাড়ির উঠানের একপাশে ছিল একটা বেগুন গাছ। শিউলির বাবা বেগুনের চারাটা এনেছিলেন বীরনগরের হাট থেকে। নিজের গরজে এনেছিলেন বলা যায় না। কে একজন বন্ধু লোক তাকে চারাটা গছিয়ে দিয়েছিলেন। চারাটা লাগানোর পর একরকম বিনা যত্নেই লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠেছিল। দফায় দফায় বেগুনও ফলেছিল বেশ কিছু পরিমাণে। শিউলির বাবা কল্যাণীতে একটা কারখানায় চাকরী করেন। দশটা পাঁচটা ডিউটি। তাই সাত-সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে যাহোক কিছু মুখে গুঁজে দিয়ে তাঁকে তাড়াহুড়ো করে ট্রেন ধরতে হয়। ফলে, বাজার থেকে সব্‌জি কেনার সময়টুকুও পান না তিনি। তাই হাতের নাগালে বেগুনগুলো পেয়ে শিউলির মা প্রায়ই রান্না করে দেন শিউলির বাবাকে। তাতে সুবিধেও হয়। সময়ও বাঁচে, ছ' পয়সা সাশ্রয়ও হয়।

সারাটা শীতকাল ধরে বেশ ভাল পরিমাণেই বেগুন পেয়েছে শিউলিরা। এখন এই ফাল্গুন মাসে বেগুন গাছটার পাতাগুলো সব খসেখসে পড়ছিল একে একে। বেগুনের ফলনও আর তেমন হচ্ছিল না আগের মতন। শিউলির বাবা উঠানের আশপাশটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বেগুন গাছটাকে কেটেই ফেলবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিউলির মা-র আপত্তিতেই তিনি তা করেন নি। শিউলিও বেগুন গাছটা কেটে ফেলার পক্ষপাতী ছিল না। উঠানের এক প্রান্তের ঐ বেগুন গাছটিতে ইতিমধ্যেই টুনটুনিতে বাসা বেঁধে ছিল। শিউলির খুব পছন্দ হয়েছিল ঐ টুনটুনির বাসাটাকে। টুনটুনিটা যখন 'টুইক—টুইক' করে ডাকত আর বেগুন গাছটার এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফালাফি

করত, তখন তা দেখে খুবই আনন্দ পেত শিউলি।

শিউলির বাবা ছিলেন কিছুটা একগুঁয়ে প্রকৃতির। তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে শিউলির মা-কে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন বেগুনের গুণহীনতার কথা। বলেছিলেন, 'ঐ গাছ রেখে কী হবে? কোন গুণ নেই বলেই তো ওর নাম বেগুন।' কিন্তু তাতেও যখন শিউলির মা গাছটা কেটে ফেলতে আপত্তি করলেন, তখন শিউলির বাবা সেই আপত্তিটাকে মেনে নিয়েও বলেছিলেন,—'তোমার আপত্তির কারণ আমি বুঝি। দিনকাল পালটে গেছে। এখন সব ক্ষেত্রেই চলছে উল্টো পুরাণের পালা। গুণের মূল্য কেউ দিক না দিক, বে-গুণের মূল্য অনেকেই দেয়। কলকাতার একটা জায়গার নাম বেহালা। হাল-ছিরি কিছু ছিল না বলেই জায়গাটার ঐ রকম নামকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই বেহালারই এক কাঠা জমির দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে অভাব। মানুষের অভাব, মানুষের প্রয়োজন বেড়ে গেছে বলেই এটা হচ্ছে।'

শিউলির বাবার কথা শেষ হতে না হতেই এক অভ্যাগত দম্পতি এসে হাজির হলেন সেখানে। ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি শিউলির বাবাকে বেগুনের চারাটা সেধে দিয়েছিলেন। উঠানে পা দিয়েই লোকটি সেই বেগুন গাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঃ, 'গাছটাতো দেখছি বেশ বড়সড় হয়েছে! এতে বেগুন হয়েছিল অনেক নিশ্চয়ই।' প্রসঙ্গটা যাতে আর না এগোয় সেজন্য তৎপর হয়েই শিউলির বাবা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'হুঁ'। তারপরই বললেন, 'এসেছেন ভালই করেছেন। খুব খুশি হয়েছি।'

অতঃপর অভ্যাগতদের সমাদর করে আসন পেতে বসতে দিলেন শিউলির মা। কিন্তু সঙ্কট দেখা দিল আপ্যায়নের প্রশ্নে। একে মাসের প্রায় শেষ, তার উপর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘট চলছে বলে শিউলির বাবার কারখানাও বন্ধ। হাতে পয়সা-কড়ি নেই। দোকানেও ধার মিলবে না। ঘরে সবকিছুই বাড়ন্ত। অতএব

অভ্যাগতদের আপ্যায়নের প্রশ্নে প্রমাদ গুণলেন শিউলির বাবা। শেষ পর্যন্ত সব সংকটের নিরসন করলেন শিউলির মা। উঠানের গাছটার কয়েকটি বেগুন তোলা ছিল ঘরে। অগত্যা সেই বেগুন ভেজে, আলুর দম আর রুটি দিয়েই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হলো অভ্যাগতদের। আপ্যায়নে আন্তরিকতার অভাব ছিলনা। কাজেই, অভ্যাগতরাও পরিতৃপ্ত হলেন। পরিস্থিতিটা সামলাতে পেরে শিউলির মা-বাবা দু'জনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই ঘটনার পর শিউলির বাবা বেগুন গাছটা কেটে ফেলার কথা ভুলেও কখনও মুখে উচ্চারণ করেন নি। বেগুনের সমালোচনাও করেন নি আর কোনদিন।

দিনকতক পরের কথা। একদিন বিকেলের দিকে রোয়াকে বসেছিলেন শিউলির বাবা। বসে বসে ভাবছিলেন সংসারের দৈন্যদশা ও অভাব অনটনের কথা। এমন সময় শিউলি কোত্থেকে ছুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'বাবা, বাবা, আমাদের বেগুন গাছটাতে টুনটুনির বাসায় দু'টো বাচ্চা হয়েছে, তুমি দেখেছ?' মেয়ের কথায় শিউলির বাবার চিন্তার ঘোর কেটে যায়। তিনি চোখ ফিরিয়ে তাকান বেগুন গাছটার দিকে। মা টুনটুনিটা সেই সময় উড়ে এসে বাসায় উপস্থিত হয়। খাবারের প্রত্যাশায় বাচ্চা দু'টো ঠোঁট উঁচিয়ে চিঁ-চিঁ শব্দে ডাকতে শুরু করে। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন শিউলির বাবা। মনে মনে ভাবেন – ঐ টুনটুনির মত তারও দুই শিশু সন্তান শিউলি এবং বাচ্চু। তারই মতন ঐ টুনটুনিটারও অভাবের সংসার। তবু ঐ বেগুন গাছটাকে আশ্রয় করেই আরও দু'টি প্রাণ প্রকৃতির রাজ্যকে কী সুন্দর করে তুলেছে। ভাবতে ভাবতে তন্ময় হ'য়ে পড়েন শিউলির বাবা। উঠানের এক প্রান্তের ঐ ছোট্ট বেগুন গাছটা শিউলির বাবার তন্ময় দৃষ্টিতে ক্রমেই মহীরুহ হয়ে ওঠে, —যাকে আশ্রয় করে কালক্রমে বড় হয়ে উঠবে টুনটুনির বাচ্চা দুটো।

চৌকিদার

বইপত্তর গুছিয়ে নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বসেছিল শুভেন্দু। বার্ষিক পরীক্ষার আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক বাকি। গত প্রায় দেড়-দু' মাস পড়াশুনার খুবই ক্ষতি হয়েছে ওর। বৃষ্টি ও বন্যায় ডুবে গিয়েছিল ওদের বাড়ি-ঘরদোর। সে সময় ওরা আশ্রয় নিয়েছিল স্থানীয় স্কুল ঘরে। মাত্র দিন তিনেক আগে ওরা বাড়ি ফিরে এসেছে। পড়তে পড়তে ক্রমশঃ রাত বাড়তে থাকে। মা এসে শুভেন্দুকে শুতে বলেন। কিন্তু শুভেন্দুর চোখে ঘুম নেই। পড়ার ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে সে বদ্ধপরিকর। মাকে একটু পরেই শোবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুভেন্দু আবার পড়ায় মন দেয়। মা মেঝেতেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়েন এবং সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন এক সময়।

দেখতে দেখতে রাত বেড়ে যায়। পার্শ্ববর্তী দত্তবাড়ির দেয়াল ঘড়িটাতে বেজে ওঠে রাত বারোটার ঘন্টা। চারিদিক নিঝুম। বাইরে শীতের ঘন কুয়াশা পড়েছে। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে শুভেন্দুর। গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নেয় সে। অদূরে বারোয়ারীতলার কাছে চৌরাস্তার মোড়ের দিকে কানাই চৌকিদারের হাঁক-ডাক শোনা যায়—'বসতি ওয়ালারা জাগো—ও - ও।' বড় ভাল মানুষ এই কানাই চৌকিদার। গাঁয়ের ছোট-বড় সবাই ভালবাসে ওকে। এক হাতে টর্চ এবং অন্য হাতে সড়কিটা নিয়ে কানাই চৌকিদার হাঁক ছাড়তে ছাড়তে চলে শুভেন্দুদের বাড়ির সামনেকার রাস্তা দিয়ে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ায় শুভেন্দু। কানাই চৌকিদারের টর্চের আলোয় রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যায়। আলোটা ক্রমে মিলিয়ে যায় দূরে। শুভেন্দুর মনে পড়ে বছর দু'য়েক

আগেকার এক নিদারুণ ঘটনার কথা।

এমনি এক রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শুভেন্দুর বাবা। শুভেন্দুর বাবা স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ঐ স্কুলেই বয়স্কদের জন্য খোলা হয়েছিল নৈশ বিদ্যালয়। শুভেন্দুর বাবা সেখানেও পড়াতেন। রাত তখন প্রায় পৌনে এগারটা। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শুভেন্দুর বাবা। পথে হঠাৎ স্ট্রোক্ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। কানাই চৌকিদার তখন সবেমাত্র পথে বেরিয়েছেন। তিনিই সেদিন শুভেন্দুর বাবাকে কাঁধে তুলে বাড়ি বয়ে এনেছিলেন। ডেকে এনেছিলেন গাঁয়ের ডাক্তার অভয় দত্তকে। যমে-মানুষে কিছুক্ষণ টানাটানি চলে। তারপর সব শেষ। শুভেন্দুর মনে পড়ে আরও অনেক কথা। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর স্কুল প্রাঙ্গণে যে শোকসভা হয়েছিল, সেখানে কানাই চৌকিদারও উপস্থিত ছিলেন। সেদিন একটা অবুঝ শিশুর মতই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন তিনি।

বাবার মৃত্যুর পর কানাই চৌকিদারের সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে শুভেন্দুর, তখনই তিনি ওদের সংসারের খোঁজ-খবর নিয়েছেন সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, 'শোন শুভ, তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, লেখা-পড়া শিখে মানুষ হতে হবে।' শুভেন্দুর চোখে কানাই চৌকিদার তাই বরাবরই এক মহৎ মানুষ, একান্ত হিতৈষী আপনজন। —ভাবতে ভাবতে শুভেন্দু তন্ময় হয়ে যায়। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অলক্ষ্যে। বাবার কথা মনে হতেই মনটা উদাস হয়ে পড়ে। চোখ দু'টো হয়ে ওঠে অশ্রুসজল। নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হয় শুভেন্দুর। হঠাৎ একটা দম্‌কা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে। শুভেন্দুর বাবার ফটোটা মনে হয় যেন একটু নড়ে-চড়ে ওঠে সেই হাওয়া লেগে। শুভেন্দু সেই ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর মেঝেতে আঁচল পেতে শুয়ে থাকা মায়ের করুণ-বিষণ্ণ মুখখানির দিকেও সে তাকায় একবার। সেই সময় দূর থেকে আবারও ভেসে আসে কানাই চৌকিদারের কণ্ঠস্বর —

—'বসতিওয়ালায়া জাগো—ও—ও।'

যদিও গাঁয়ের মানুষকে সজাগ করে দিতেই এই আহ্বান, কিন্তু কানাই চৌকিদারের সেই আহ্বান অনেকের কানেই পৌঁছায় না। কেননা, গাঁয়ের লোক প্রায় সকলেই তখন গভীর ঘুমে অচেতন। কানাই চৌকিদারের জিম্মায় নিজেদের ধন-সম্পত্তি ও নিরাপত্তার ভার সঁপে দিয়ে গাঁয়ের লোক তখন নিশ্চিন্ত। শুভেন্দু কিন্তু সেই আহ্বানের মধ্যে এক ভিন্নতর তাৎপর্য খুঁজে পায়। বাবার মৃত্যুর পর যে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে শুভেন্দুদের সংসারে, সে সম্পর্কে সজাগ করে দিতেই যেন কানাই চৌকিদারের এই আহ্বান।'—শুভেন্দু ভাবে। মুহূর্তে কর্তব্য সচেতন হয়ে ওঠে শুভেন্দু। বাংলা ব্যাকরণ বইটা আরও কিছুটা কাছে টেনে নেয় সে। তারপর ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে পড়তে শুরু করে ভাব সম্প্রসারণটা,—'কঠিন শ্রমের কোন বিকল্প নেই।'

ডাবলুর বুদ্ধি-সুদ্ধি

পলাশডাঙ্গার ফটিকবাবুর ছেলে ডাবলু। নিজেকে সে খুব চালাক-চতুর মনে করত। পড়াশোনায় ডাবলু তেমন ভাল ছিল না বটে, কিন্তু খেলাধূলায় ওর আগ্রহ ছিল প্রবল। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাইজ পাওয়ার একটা ঝোঁক চেপে বসেছিল ওর মাথায়। গত বছর ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টসে ওর বন্ধু কেষ্ট একশো মিটার দৌড়ে ফার্স্ট হয়েছিল। খুব ভাল দৌড়েছিল ছেলেটা। একটা কোলা ব্যাঙের মত প্রথম লাফ দিয়ে কেষ্ট শুরু করছিল ওর দৌড়টা। তারপর ঘোড়ার মত দুরন্ত বেগে ছুটে সে ফার্স্ট হয়েছিল সবাইকে টেক্কা দিয়ে। কেষ্ট যখন দৌড়ে ফার্স্ট হয়েছিল তখন সবার সে কী হাততালি! সেদিনের কথাটা ডাবলু আজও ভুলতে পারেনি।

সেদিন থেকেই কেষ্টর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ডাবলু। স্কুলের ছুটির পর প্রায়ই ডাবলু কেষ্টর সঙ্গে একসঙ্গে বাড়ি ফিরত। ডাবলু প্রায়ই কেষ্টকে এটা-সেটা কিনে খাওয়াতো এবং কৌশলে ওর কাছ থেকে জেনে নিত দৌড়ানোর টেকনিকগুলো। কেষ্ট অকৃতজ্ঞ ছিল না। সাদা মনেই সে ডাবলুকে সব খুলে বলত। কথা প্রসঙ্গে কেষ্টর কাছ থেকেই ডাবলু শুনেছিল যে, ঘোড়া যে অত জোরে ছুটতে পারে তার কারণ ঘোড়া ছোলা খায়। শেয়ালের যে অতো বুদ্ধি তার কারণ শেয়াল কাঁকড়া খায়। এসব শুনে ডাবলু মনে মনে ভাবত, সেও ছোলা খেয়ে ঘোড়ার মত ছুটে স্পোর্টসে ফার্স্ট হবে এবং সুস্বাদু কাঁকড়া খেয়ে শেয়ালের মত পণ্ডিত হবে।

বছর দেড়েক পরের কথা। অনেকদিন পর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন কেষ্টর ছোটকাকা। কেষ্টর ছোটকাকা হাজারীবাগে চাকরী

করেন। মাথায় তাঁর মস্ত টাক। খুব মজার গল্প বলেন তিনি। শোনা যায়, মাথার চুল তুলে দেওয়ার শর্তে ছোটদের গল্প বলে বলেই নাকি তাঁর মাথার মাঝখানে টাক পড়ে গিয়েছিল। একদিন গল্প শুনতে কেষ্টর সেই ছোটকাকাকে ঘিরে ধরল কেষ্ট এবং ডাবলু। আগ্রহটা অবশ্য ডাবলুরই তুলনায় বেশি। কেষ্টর ছোটকাকা বারান্দায় গ্যাঁট হয়ে বসলেন। ডাবলু ও কেষ্ট পাকা চুল তুলতে তুলতে শুনতে লাগল কেষ্টর ছোটকাকার গল্প।

সেদিন ছিল চাঁদনী রাত। চাঁদের আলোয় খুশী মনে খাবারের সন্ধানে বের হয়েছিল এক শেয়াল। শেয়াল খাবারের খোঁজে এদিক-সেদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত হাজির হলো একটা ডোবার ধারে। সেখানে কতকগুলো কাঁকড়ার গর্ত দেখতে পেল শেয়ালটা। শেয়ালটা তখন একটা গর্তের পাশে চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে রইল। ভাবল— কাঁকড়াটা যেমনি ওপরে উঠে আসবে অমনি খপ্ করে ধরে কড়মড় করে আরামে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। শেয়ালটা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করল। কিন্তু কাঁকড়াটা কিছুতেই গর্তের বাইরে এল না। তোমরা তো জান, শেয়ালের খুব বুদ্ধি। তাই শেয়ালকে লোকে বলে শেয়াল পণ্ডিত। শেয়ালটা তখন মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি খরচ করে একটা উপায় খুঁজে বার করল। সে তখন ঐ কাঁকড়ার গর্তটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ওর লেজটা এবং ক্রমশঃ নিচু হয়ে বসে পড়তে লাগল। ফলে লেজের মাথাটা গর্তের ভেতরকার কাঁকড়ার নাকে-মুখে গিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। কাঁকড়াটা ছিল গর্তের একেবারে শেষ প্রান্তে। তাই সে মহা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অগত্যা নাক-মুখ বাঁচানোর জন্য কাঁকড়াটা সামনেকার দুটি সাঁড়াশীর মতন ধারালো পা দিয়ে চেপে ধরল শেয়ালের লেজটাকে। টের পেয়ে শেয়ালটা শূন্যপানে মারল এক লাফ। হ্যাঁচকা টানে সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে এল গর্তের কাঁকড়াটা। শেয়ালটা তৎক্ষণাৎ কড়মড় করে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে ফেলল কাঁকড়াটাকে। গল্পটা শুনে ডাবলুর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে উঠেছিল।

পরদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ডাবলুর কেবলই মনে পড়ছিল কেষ্টর ছোটকাকার গল্পটার কথা। ডাবলু মনে মনে শেয়াল পণ্ডিতের মতই

পণ্ডিত হবার স্বপ্ন দেখছিল। বাড়ি ফেরার পথের ধারেই ছিল মস্ত একটা বিল। কিছু লোক সেখানে জাল ফেলে মাছ ধরছিল। ডাবলু হঠাৎ দেখতে পেল যে, একটা লোকের খালুই-এর মধ্যে অনেকগুলো কাঁকড়া ধরা পড়েছে। খালুইটা ছিল অবশ্য জাল দিয়ে ঢাকা। ডাবলু উঁকি মেরে দেখল কাঁকড়াগুলো সব ঘোরাফেরা করছে খালুই-এর মধ্যে। ডাবলুর মনে পড়ল কেষ্টর ছোটকাকার গল্পটার কথা। মনে পড়ল কেষ্টর কথাও। কেষ্টও বলেছিল, কাঁকড়া খায় বলেই শেয়ালের অত বুদ্ধি। ডাবলু তক্ষুণি জলখাবারের জমানো পয়সাগুলো বের করল পকেট থেকে। তারপর ব্যাগ থেকে বইগুলো বের করে নিয়ে ওর মধ্যেই কিনে নিল দু'-টাকার কাঁকড়া। লোকটা কাঁকড়াগুলোকে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়েই ব্যাগটার বেল্ট আচ্ছা করে আটকে দিয়েছিল, যাতে কাঁকড়াগুলে বেরিয়ে যেতে না পারে।

বাড়ি ফিরে উঠানে পা দিয়েই ডাবলু মাকে ডাকাডাকি শুরু করল। ওর মা বাড়ি ছিলেন না। গিয়েছিলেন পাশের বাড়ি। হাঁক-ডাক শুনে ফিরছিলেন। একটু তফাতে মাকে দেখেই আনন্দের আতিশয্যে ডাবলু ব্যাগটা খুলে মাটিতে ঢেলে দিল কাঁকড়াগুলোকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁকড়াগুলো ছুটতে লাগল চারদিকে। ডাবলু যেমনি ধরতে যায় কোনটাকে, অমনি সেটা সামনের সাঁড়াশীর মত দু'পা উঁচিয়ে তেড়ে আসে। ডাবলু তখন কেবলই লাফাচ্ছে আর গেল গেল বলে চেঁচাচ্ছে। ওর চেঁচামেচি শুনে ছুটে এল পাড়ার কিছু লোক। কিন্তু ততক্ষণে কাঁকড়াগুলো সব বাড়ির পাশের ডোবায় নেমে পড়েছে। সব দেখেশুনে ডাবলু তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের বোকামির কথা ভেবে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল ওর। মা অনেক গালমন্দ করলেন ডাবলুকে। বললেন, "হ্যাঁরে ডাবলু, তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে হবে বল দিকি? এই সেদিন ক্লাবের স্পোর্টসে ঘোড়ার মত দৌড়ে সবাইকে হারাবি বলে পাঁচশো গ্রাম ছোলা ভিজিয়ে খেয়ে সাতদিন পেটের অসুখে ভুগলি। আজ আবার কাঁকড়া কিনে এনে এই কাণ্ড করলি?' মায়ের কথাগুলো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত বোধ হতে লাগল ডাবলুর।

সোনা ব্যাঙের সাধ

শিয়ালদহ ডিভিসনের যে রেল লাইনটা রানাঘাট হয়ে লালগোলা পর্যন্ত চলে গেছে, সেই লাইনের ধারের একটা খাদের মধ্যে সংসার পেতেছিল একটা সোনা ব্যাঙ। স্ত্রী-পুত্র, আত্ম-পরিজন নিয়ে সোনা ব্যাঙটার ছিল একেবারে সোনার সংসার। অভাব অনটন বড় একটা ছিল না ওর সংসারে। সংসারের সবাই করিতকর্মা, সবাই খেটে খায়। আগে অবশ্য অভাবটা একেবারেই ছিল না। ইদানীং চাষবাসের নিয়ম-পদ্ধতি পাল্টে গেছে। জমিতে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য চাষীরা নানারকম কীটনাশক ওষুধ-পত্র ব্যবহার করছে। তাই অভাবটা একটু বেড়েছে ঠিকই, তবে অবস্থাটা এমন হয়নি যে ওদের না খেয়ে উপোস করে মরতে হবে।

এখন বর্ষাকাল। বছরের এই সময়টা ওদের মহা আনন্দের দিন। সারাদিন অঝোরে বৃষ্টি ঝরে। শ্রাবণের আকাশটা মেঘে মেঘে ছয়লাপ। দূর থেকে মেঘের গুড়ু গুড়ু ডাক শুনলেই ওদের মনে আনন্দের দোলা লাগে। তারপর যখন শুরু হয় অবিরাম ধারা বর্ষণ, যখন খাদটা জলে জলে টইটুম্বুর হয়ে যায়, তখন খুশীর বান ডাকে ওদের মনে। সোনা ব্যাঙটা পড়শীদের সঙ্গে এক সুরে ডাকতে থাকে ঘ্যাঁ-ঘোঁ শব্দে। স্ত্রী ব্যাঙটা ডাকতে পারে না। কিন্তু ওর মনেও জাগে পুলক শিহরণ। কিছুদিন হলো স্ত্রী ব্যাঙটা অনেকগুলো বাচ্ছা দিয়েছে একই সঙ্গে। বংশ-বৃদ্ধি হচ্ছে পঙ্গপালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ব্যাঙাচিগুলো আস্তে আস্তে বড় হবে। ওরা বড় হলে ওদের আবার বাচ্চা হবে অচিরেই। অতএব সোনা ব্যাঙের এখন এককথায় সুখের সংসার।

কিন্তু এত সুখের মধ্যেও সোনা ব্যাঙের দুঃখ একটা আছে। রেল-

লাইনের পাশের ঐ ঝোপটার মধ্যে যে গোখরো সাপটা থাকে, সেটা প্রায়ই জ্বালাতন করে ওকে। যার জন্য খাদের উপরে উঠে নিশ্চিন্ত মনে ট্রেনের ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটা দু'চোখ ভরে দেখতে পায় না সে। মনে সংশয় নিয়ে কোন কাজেই সুখ বা তৃপ্তি পাওয়া যায়না। সোনা ব্যাঙটাও তার ব্যতিক্রম নয়। জলের উপর মাথা ভাসিয়ে সে অবশ্য প্রায়ই ট্রেন চলে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখে, কিন্তু তাতে ওর তেমন তৃপ্তি হয়না, মন ভরেনা। তাই একদিন সে সাহসে ভর করে খাদটার পাড়ে অনেকটা উপরে উঠে এসেছিল। উঠে এসেছিল প্রায় ঝোপটার কাছাকাছি। সেখান থেকে ট্রেনের লোকগুলো যারা জানালার পাশে বসেছিল, তাদের স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল সোনা ব্যাঙটা। মনটা ওর খুশীতে ভরে উঠেছিল তা দেখে। মনে মনে সে ভেবেছিল, 'ঈস কী সুখ, কী আনন্দ ঐ মানুষগুলোর, যারা ট্রেনে করে যাচ্ছে দূর-দূরান্তে। ভাবতে ভাবতে সোনা ব্যাঙটার মনেও সাধ জাগে ঐভাবে ট্রেনে করে দূর দূরান্তে পাড়ি জমাতে।

কিছুদিন পরের ঘটনা। রাত্রিবেলায় সোনা ব্যাঙটা যখন খাদের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তখন সে একটা তীব্র আলো দেখতে পেল কিছুটা দূরেই। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সোনা ব্যাঙটা তাই এতক্ষণ পড়শীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঘ্যাঁ-ঘোঁ ডাক ডেকেছে। স্ত্রী-ব্যাঙটা পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থেকেছে। ভেবেছে, কী মিষ্টি ওর গলা। স্ত্রী ব্যাঙটা যখন এসব ভেবেছে তন্ময় হয়ে, ঠিক তখনই সোনা ব্যাঙটা .বুঝতে পারল আচমকা একটা চাপ পড়ল ওর দেহের উপর। কিছু বোঝার আগেই একটা লোক লাঠির মাথায় লাগানো জাল দিয়ে সোনা ব্যাঙটাকে ধরে তুলে নিয়ে গেল পাড়ে। তারপর রেখে দিল অন্য একটা বড় জালের মধ্যে। সেখানে আরও অনেক সোনা ব্যাঙের গাদাগাদি অবস্থান। সোনা ব্যাঙটাকে ধরার পর লোকটা আবার খাদে নেমেছিল অন্যদের ধরতে। ওর সঙ্গী লোকটা হ্যাচাক উঁচু করে তুলে ধরে দাঁড়িয়েছিল জলের কিনারায়। কিন্তু ততক্ষণে বিপদ বুঝে ডাক বন্ধ করে জলের গভীরে

আত্মগোপন করেছিল সবাই।

এইভাবে জালে আবদ্ধ হয়ে প্রথমটা বেশ কিছুটা হতচকিত হলেও সোনা ব্যাঙটা ভয়ে মুষড়ে পড়েনি। কেননা, তার মনে ভরসা ছিল এই যে, সে তো একা নয়। আরও অনেকেই তার সঙ্গে রয়েছে। তাহলে আর অযথা এত ভয় কীসের? সবার কপালে যা আছে ওরও তাই হবে —সোনা ব্যাঙটা ভাবতে থাকে। এরপর লোকগুলো সেদিনের মত ফিরে আসে ওদের নিজেদের বাড়ি। সোনা ব্যাঙগুলোকে রেখে দেওয়া হল ওদের একচালা ঘরের বারান্দায়। জালটা এমন করে বাঁধা ছিল যে, ব্যাঙগুলো অনেক শলাপরামর্শ করেও বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে পারল না। অসহায় যারা, তাদের যা হয়, সোনা ব্যাঙগুলোর অবস্থাও তাই হল। অসহায়ভাবে ওরা প্রবলের কারাগারে হয়ে রইল বন্দী। এইভাবে বন্দী থেকে থেকে খাদের সোনা ব্যাঙটা ক্রমশঃ বুঝতে পারল যে এক কঠিন মুহূর্ত ওদের জন্যে অপেক্ষমান। সেই মুহূর্তে সোনা ব্যাঙটার কেবলই ওর স্ত্রী এবং বড় আদরের কচি কচি ব্যাঙাচির কথা মনে পড়তে লাগল। এভাবেই কেটে গেল রাতটা।

পরদিন খুব ভোরে লোকদুটো ব্যাঙগুলোকে নিয়ে গেল গঞ্জের মোকামে. সেখানে আরও অনেকেই জালে বন্দী করে অনেক সোনা ব্যাঙ নিয়ে এসেছিল। খাদের সোনা ব্যাঙটা দেখতে পেল, একটা ঘরে ওদের নিয়ে রাখা হল। ঘরের এক কোণে বসেছিল কয়েকজন লোক। হঠাৎ সেদিকে তাকাতেই সোনা ব্যাঙটার বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে দেখতে পেল একটা কালো ধুমসো মত লোক একটা জাল থেকে এক এক করে ব্যাঙগুলোকে সাবধানে তুলে নিচ্ছে এবং পেট আর মাথাটা কেটে কেটে বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশটুকু একটা বড় ঝুঁড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা। সোনা ব্যাঙটা বুঝতে পারল যে কিছুক্ষণ পর ওরও ঐ একই দশা হবে। সোনা ব্যাঙের মাথাটা একবার যেন পাক খেয়ে গেল। ঘাতকের সামনে নিজের গলাটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার প্রাক-মুহূর্তে আবারও ওর মনে পড়ল খাদের স্ত্রী-ব্যাঙের

কথা, আদরের কচি কচি ব্যাঙাচির কথা। ইতিমধ্যে একটা লম্বাটে লোক এসে ঢুকল সেই ঘরটাতে। সে জানাল যে কি একটা কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। সেদিন আর ট্রেন চলবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সোনা ব্যাঙটা বুঝতে পারল হয়তো ওদের মৃত্যুটা এতে কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে। হলোও ঠিক তাই। লোকগুলো ঘরটাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। সহসা আর ফিরে এল না। কিন্তু মৃত্যুকে অবধারিত জেনে এভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? সোনা ব্যাঙের তখন কত কথাই না মনে পড়ছিল একে একে। সে ভাবছিল ওর সাজানো সংসারের কথা, ওর স্ত্রীর কথা, কচি কচি ব্যাঙাচির কথা। ভাবতে ভাবতে এক একবার মানুষ জাতটার উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল ওর। সোনা ব্যাঙটা ভাবছিল, আমরা তো মানুষের কোন ক্ষতি করি না। বরং পোকা-মাকড় খেয়ে বিনাশ করে ওদের উপকারই করি। তবু মানুষ কত অকৃতজ্ঞ, কত নির্মম। আমাদের মত নিরীহ নিরপরাধের বুকের রক্ত ঝরাতে ওদের বিন্দুমাত্র বিবেকে বাধে না। কৈ, আগে তো কখনও এমন হয়নি। আগে জানতুম সাপই আমাদের একমাত্র শত্রু। মানুষ কি তাহলে সাপের চেয়েও খল, সাপের চেয়েও ভয়ংকর? এরপর সোনা ব্যাঙটা আবারও ভাবতে থাকে—না সব মানুষই হয়তো তা নয়। এমন কি ছোট ছোট শিশুদের মধ্যেও মায়া, মমতা, সহানুভূতি কিছু কম নেই। সোনা ব্যাঙটার মনে পড়ে একটা ঘটনার কথা। একবার কতকগুলো ছেলে নাকি একটা ডোবার মধ্যে খেলাচ্ছলে ঢিল ছুঁড়ছিল। সেই ডোবায় ছিল অনেক ব্যাঙ। ঢিলের আঘাতে ব্যাঙগুলোর যখন জীবনহানির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন একটা বুড়ো ব্যাঙ সাহস করে জল থেকে মাথা তুলে ওদের ঢিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছিল ওদের অসুবিধের কথা জানিয়ে। ছেলেগুলো নাকি সঙ্গে সঙ্গে ঢিল ছোঁড়া বন্ধও করেছিল। এসব অবশ্য সোনা ব্যাঙটার শোনা কথা। এমনিভাবে সে যখন ভাবনায় বিভোর, ঠিক সেই মুহূর্তে লোকগুলো আবার ফিরে এল। তারপর একে একে জবাই করল

সবগুলো সোনা ব্যাঙকে। খাদের সোনা ব্যাঙটাও রেহাই পেল না। বঁটিতে গলা কাটার সময় আচ্ছন্নের মত ওর মনে হয়েছিল শেষবারের মত ওর স্ত্রী ও ব্যাঙাচিগুলোর কথা। এর পর ঝুঁড়ির মধ্যে কাটা ব্যাঙের গাদায় স্থান হয়েছিল ওর। ইতিমধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। সোনা ব্যাঙের লাশটা ঝুঁড়িবন্দী হয়ে ট্রেনে চেপে যাত্রা করেছিল বিদেশের পথে। এভাবেই সোনা ব্যাঙের ট্রেনে চড়ার সাধ পূর্ণ হয়েছিল।

মধ্যরাতের রহস্য

অনেকদিন পর ছোটন বেড়াতে গিয়েছিল ওর মামাবাড়ি বেলগাছিয়ায়। সেখানে মামাদের বাসার উত্তর দিকটাতে আগে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল, এবারে গিয়ে সে দেখতে পেল, সেখানে নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে সব সারি সারি। এর আগে যখন সে গিয়েছিল, তখন মামাদের একটা ঘরে বসে উত্তর দিকটার জানালাটা খুললেই তার চোখে পড়ত, ছেলেরা সব দল বেঁধে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে খেলা করছে।

মামাবাড়ি বেড়াতে গেলে রাত্রিবেলায় ছোটন ওর দিমার সঙ্গে ঐ ঘরটাতেই থাকত। এবারও যখন সে গিয়েছিল, তখন তাকে ঐ ঘরটাতেই শুতে দেওয়া হয়েছিল। দিমা তখনও রান্নাঘর থেকে শুতে আসেননি। এমন সময় ছোটনের নজরে পড়ল, পাশের বাড়ির একটা ঘরে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে কী যেন সব বলছে। লোকটির ঐ ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা দেখে ছোটন অবাক হয়ে গেল। ওর কিছুটা ভয় ভয়ও করছিল। জানালার দিকে কিছুটা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটা ঐ রকম করছিল। লোকটার কণ্ঠস্বর ছিল ভয়ানক গম্ভীর। দু'চোখ বড় বড় করে এবং দাঁত কট্‌মট্‌ করে সে এমন ভাব করছিল যে তা দেখে ছোটনের মনে হয়েছিল—লোকটা একটা বদ্ধ পাগল।

কিছুক্ষণ পর ছোটনের দিমা এলেন শুতে। ততক্ষণে পাশের বাড়ির জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল কে যেন। আর কোন সাড়া শব্দই এলো না সেদিক থেকে। এদিকে দিমা ঘরে আসা মাত্র ছোটন যা সব দেখেছে তা খুলে বলল দিমাকে। দিমা বললেন, 'কৈ না-তো। কোন

পাগল তো নেই কেউ ও বাড়িতে!' অবশ্য দিমা এও বললেন যে, ঐ বাড়িতে এখন যাঁরা থাকেন, তাঁরা অল্পদিন এসেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে মামা-বাড়ির তেমন একটা আলাপ-পরিচয় হয়নি এখনও পর্যন্ত। সামান্য যা কিছু আলাপ পরিচয় হয়েছে তা একমাত্র মামার সঙ্গে। দিমা শুধু এটুকুই বললেন [illegible] ভদ্রলোকের নাম বাঞ্ছারাম দত্ত না কি দাস এ রকম একটা কিছু।

এরপর ছোটন এ প্রসঙ্গে দিমার কাছ থেকে আর কিছু জানতে চায়নি। সেদিন রাত্রে দিমার কাছে শুয়ে শুয়ে ছোটন রাজপুত্তুর-কোটাল পুত্তুরের গল্প শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছোটন ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে দিমাও একসময় জপের মালাটা মাথায় ঠেকিয়ে শিয়রের পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ছোটনের। তার কানে আবারও ভেসে এল পাশের বাড়ি থেকে সেই কণ্ঠস্বর এবং মাঝে মাঝে বিকট অট্টহাসি। ছোটন এগিয়ে গেল জানালার ধারে। গিয়ে দেখল, পাশের বাড়ির জানালাটা খোলা এবং ভেতরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা। চেহারাটা মোষের মত ধুমসো। গায়ের রঙ মিশকালো এবং দেহটা মোষের মতই মাংসল। কিন্তু দেখা গেল এবারে আর লোকটি একা নয়। তার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন মহিলা। লোকটি সেই মহিলার চুলের মুঠি শাসানির ভঙ্গিতে চাপা গলায় কি সব বলছে। ছোটনের মনে হচ্ছিল, লোকটি হয়তো ওর গলাই টিপে ধরবে শেষ পর্যন্ত। ছোটন সঙ্গে সঙ্গে জানালার কাছ থেকে ছুটে এসে দিমাকে ডাকল, 'দিমা-দিমা, ও-ও দিমা।' ঠিক সেই মুহূর্তেই হ'ল লোড শেডিং। পাশের বাড়ির ঘরটায় আলো নিভে যেতেই আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না সে দিক থেকে। দিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে ছটু, ডাকছিলি কেন? স্বপ্ন দেখে ভয়-টয় পেয়েছিস বুঝি?' এ কথায় কোন উত্তরই জোগাল না ছোটনের কণ্ঠে। ভয়ে তখন ছোটনের গলাটা শুকিয়ে কাঠ। টেবিলের উপর কাঁচের গ্লাসে

যে জলটা রাখা ছিল ঢক্ ঢক্ করে সেই জলটা মুখে ঢেলে দিল ছোটন। তারপর দিমার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল সে।

'পরদিন সকালবেলা মামার কাছ থেকে পাশের বাড়ির লোকগুলো সম্পর্কে সব জানতে হবে।'—ছোটন মনে মনে ভাবল। কিন্তু মামা চিৎপুরে কি একটা কারখানায় কাজ করেন। মর্নিং শিফ্‌ট ডিউটি। ছোটন ঘুম থেকে ওঠার আগেই ডিউটিতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। কাজেই মামাকে জিজ্ঞেস করার কোন সুযোগই পেল না ছোটন। সে তখন মামাতো ভাই সুদীপকে বলল, 'হ্যাঁরে সুদীপ, ঐ বাড়িটাতে কেউ মারা গিয়েছে কাল রাত্রে শুনেছিস? কোন পুলিসের গাড়ি দেখেছিস রাস্তায়?' উত্তরে সুদীপ বলেছিল, 'কৈ না তো!'

এদিকে সেদিন বিকেলেই ছোটনের বাবা এলেন ছোটনকে নিয়ে যেতে। পরদিন স্কুলে ছোটনদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুবে। তাই ছোটনকে বিকেলেই চলে আসতে হল ওদের বেলঘরিয়ার বাড়িতে। সঙ্গে ছোটনের মামাতো ভাই সুদীপও এসেছিল। পরদিন স্কুলের রেজাল্ট বের হল। দেখা গেল, ছোটন ভালভাবেই পাশ করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছে। বাড়িতে তাই সবাই খুব খুশি। সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন ছোটনের ছোটকাকা। কারণ, এ বছর ছোটকাকার উপরই ছিল ছোটনের পড়াশুনার দায় দায়িত্ব। আনন্দের আতিশয্যে ছোট কাকা সন্ধেবেলায় প্রস্তাব করলেন যে, ছোটনকে নিয়ে যাত্রা শুনতে যাবেন ফুলবাগানের মাঠে। ওখানে কলকাতার এক নামকরা যাত্রাদলের আসর বসেছে বলেও তিনি জানালেন।

রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরেই ছোটকাকার সঙ্গে ছোটন এবং ওর মামাতো ভাই সুদীপ রওনা হল যাত্রা শুনতে। ছোটকাকা ভাল তবলা বাজাতে জানতেন। সেই সুবাদে ঐ যাত্রা দলের তবলচির সঙ্গেও তাঁর জানাশুনা ছিল। তাই যাত্রার আসরে মিউজিক পার্টির ঠিক পেছনেই বসার জায়গা হয়ে গেল ছোটনদের। যথা সময়ে যাত্রা শুরু হল। স্টেজে এসে হাজির হল একটা লোক। একটু পরেই দেখা গেল একজন

মহিলা অভিনেত্রীকে। লোকটা অভিনয় করতে করতে একসময় হঠাৎ চুলের মুঠি চেপে ধরল সেই মহিলা অভিনেত্রীর। ছোটনের বুঝতে দেরি হল না, ওরা দু'জনেই ওর মামাবাড়ির পাশের বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে দিন এই অভিনয়টাই তালিম দিচ্ছিল।—'লোকটাকে চিনিস সুদীপ?' —সুদীপকে প্রশ্ন করতেই সে ছোটনকে বলল, 'হ্যাঁ, চিনি বৈকি! ইনি আমাদের পাশের বাড়ির নতুন বাড়িওয়ালা বাঞ্ছারাম দত্ত।'

ফার্স্ট প্রাইজ

সন্তুর মনে ভীষণ দুঃখ। প্রতি বছরই ওর বন্ধুরা সবাই স্কুলের স্পোর্টসে একটা না একটা প্রাইজ পায়। কিন্তু ওর ভাগ্যে একটা প্রাইজও জোটেনি কোনবারই। গত বছর হিটে একশ মিটার দৌড়ে ফার্স্ট হয়েও ফাইনালে সে একটুর জন্য থার্ড হতে পারেনি। পিছন থেকে হাত বাঁধা অবস্থায় ছুটে গিয়ে ঝুলন্ত বিস্কুটটাকে লাফিয়ে উঠে কামড়ে নেবার খেলাতেও সে ব্যর্থ হয়েছিল। তিন-চারবার লাফিয়েও সে বিস্কুটটাকে কামড়ে নিতে পারেনি। বিস্কুটটা কোনবার লেগেছে ওর নাকে, কোনবার কপালে বা থুতনিতে। সন্তুর বন্ধু রাজু, রাহুল, সঞ্জয় ওরা খপাখপ বিস্কুট মুখে পুরে ছুটে ফিরে গিয়ে যথাক্রমে ফার্স্ট, সেকেণ্ড এবং থার্ড হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দিলীপ মাষ্টারমশায় সুতোয় বাঁধা বিস্কুটটা ছিঁড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে সেটাকে সন্তুর মুখে পুরে দিয়েছিলেন। এতে সান্ত্বনার পরিবর্তে দুঃখ ও লজ্জাই পেয়েছিল সে বেশি। সেদিনের কথা সন্তু আজও ভুলতে পারেনি।

এবছরের স্পোর্টসের নোটিশ পাওয়ামাত্র ছেলেদের মধ্যে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। নির্দিষ্ট তারিখের অনেক আগেই বিভিন্ন খেলায় ছেলেরা যে-যার নাম জমা দিল মাষ্টারমশায়ের কাছে। কিন্তু সন্তুকে নাম লেখাতে দেখা গেলনা। স্পোর্টসের ব্যাপারে সন্তুকে একেবারেই নির্বিকার মনে হল। রাজু, রাহুল, সঞ্জয় ওরা সবাই সন্তুকে প্রশ্ন করেছিল কেন সে স্পোর্টসে নাম দেয়নি। কিন্তু কেউই কোন সদুত্তর পেল না ওর কাছ থেকে। স্পোর্টসের আগের দিন দিলীপবাবু বললেন—কী সন্তু! তুমি নাকি এবার স্পোর্টসে নাম দাওনি? সন্তু ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিয়েছিল ওর নাম না দেবার কথা।

স্পোর্টসের দিন সন্তু যথারীতি স্কুলের মাঠে গিয়ে হাজির হল। সন্তুর বন্ধুরা কেউ একশ মিটার দৌড়ে সেকেণ্ড, কেউ অঙ্ক রেসে থার্ড, আবার কেউবা হাইজাম্পে থার্ড হল। কিন্তু ওরা কেউই এ বছর কোন খেলায় ফার্স্ট হতে পারল না। স্পোর্টস প্রায় শেষ হবার মুখে। 'গো এ্যাজ ইউ লাইক এর খেলাটা শুরু হবার কথা মাইকে ঘোষণা করা হল। এই খেলাটিতে অংশগ্রহণ করতে অবশ্য আগে থেকে নাম দিতে হয়না।

ঘোষণার কিছু পরই দেখা গেল,—কেউ হকার সেজে, কেউ পাগল সেজে, আবার কেউ বা পাখিধরা ব্যাধের সাজ নিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্তু এতক্ষণ মাঠের ধারেই বসেছিল। হঠাৎ সে মাঠের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে গেল। পকেট থেকে একটা প্লাষ্টিকের সাদা কালো ডোরাকাটা সাপ রাখল মাটিতে। তারপর মাটিতে পুঁতে দিল একটা কাঠি। কাঠিটার মাথায় লাগানো ছিল ছোট্ট একটা পিসবোর্ডের প্ল্যাকার্ড। এরপর সন্তু মাটিতে আসন করে বসল চোখ বুঁজে ধ্যান করার ভঙ্গিতে। অনেকক্ষণ সে ঠায় বসে রইল একইভাবে। সমবেত দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল সন্তুর দিকে। সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ওর। গো এ্যাজ ইউ লাইক-এ ফার্স্ট প্রাইজটা সন্তুই পেল।

এক হাতে চমৎকার প্রাইজটা এবং অন্য হাতে প্লাষ্টিকের সাপ এবং প্ল্যাকার্ডটা নিয়ে সন্তু যখন বাড়ির দিকে ফিরছিল, তখন তা দেখে রাজু, রাহুল ও সঞ্জয় ওরা ট্যারা হয়ে গিয়েছিল একেবারে। প্ল্যাকার্ডে লাল-কালিতে সন্তুর কাঁচা হাতের লেখাটা তখনও জ্বল জ্বল করছিল। তাতে লেখা ছিল—'বিলের ধ্যান ধ্যান খেলা।'

চাঁদের বুড়ি

সেদিন ছিল রাস পূর্ণিমা। রাতের আকাশ চাঁদের রূপালী আলোয় ঝলমল করছিল। এমনি রাতে হঠাৎই ঘুম ভেঙ্গে গেল বুবুনের। সে বিছানায় উঠে বসলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো কিছুক্ষণ। তারপর মায়ের কাছে বায়না ধরলো তাকে ছাদে নিয়ে যেতে। ছাদে উঠে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দূর আকাশের পানে। মা-ঠাকুমাদের কাছে সে চাঁদের বুড়ির কথা অনেক শুনেছে। শুনে শুনে তার মনে বদ্ধমূল একটা ধারণা জন্মেছিল যে, চাঁদের বুড়ি দিনরাত্রির বসে বসে চরকায় সুতো কাটে। গত বছর বড়দিনের ছুটিতে ফুলপিসির সঙ্গে সে গিয়েছিল আলিপুরে চিড়িয়াখানায়। ফেরার পথে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এবং তারপর গড়ের মাঠে। একটা ফুচকাওয়ালার দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎই তার নজরে পড়েছিল, আঁশযুক্ত সুতো মতন লম্বা সাদা কি একটা বস্তু আকাশ থেকে ভেসে ভেসে ক্রমশঃ মাটিতে নেমে আসছে। ফুলপিসি বলেছিলেন, ওটা নাকি চাঁদের বুড়ির চড়কায় কাটা সুতো। বুড়ির হাত ফসকে নেমে এসেছে। সেদিন বুবুন ফুলপিসির কাছ থেকে চাঁদের বুড়ির আরও অনেক কথাই শুনেছিল। মনে মনে সে চাঁদের বুড়িকে তার ঠাকুমার মতনই একজন বলে কল্পনা করে নিয়েছিল।

কিন্তু আজ স্কুলে শোভা দিদিমণি বিজ্ঞানের ক্লাশে যখন বলছিলেন যে, আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন প্রমুখ মহাকাশচারীরা চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেছেন এবং দেখেছেন যে সেখানে নাকি জনপ্রাণীর কোন অস্তিত্বই নেই, তখন বুবুনের মনে একটা খটকা লেগেছিল। ঠাকুমা বেঁচে নেই। ফুল-পিসিরও বিয়ে হয়ে গেছে। তাই বাড়ি এসে সরাসরি মাকেই সে বলল, শোভা দিদিমণি যা বলেছিলেন সেসব কথা। মাকে সে প্রশ্নও করেছিল

অনেক। মা তখন রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বলেছিলেন ব্যাপারটা তিনি পরে তাকে বুঝিয়ে দেবেন।

সন্ধ্যেবেলায় বুবুনের পড়ায় মন বসলো না। শুয়ে শুয়ে সে কেবল চাঁদের বুড়ির কথা ভাবছিল আর প্রতীক্ষা করছিল, মা কখন এসে শুয়ে শুয়ে তাকে সব কথা বলবেন। ইতিমধ্যে বুবুন অবশ্য একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিল যে, শোভা দিদিমণির কথা অনুযায়ী চাঁদে জনপ্রাণী না থাকলেও চাঁদের বুড়ি অবশ্যই আছে। অন্য কোন লোক সেখানে নেই বলেই হয়তো চাঁদের বুড়ি চরকায় সুতো কেটে নিজের হাতে নিজে কাপড় বোনে।

এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুবুনের তা খেয়ালই ছিল না। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখছিল— পৃথিবীর মানুষ অনেকেই চাঁদে গিয়ে হাজির হয়েছে। চাঁদের কতটুকু স্থান কে দখল করবে, তাই নিয়ে চলছে বাকবিতণ্ডা এবং খুনোখুনি কাণ্ড। মানুষের এসব কাণ্ড কারখানা দেখে চাঁদের বুড়ি লাঠি ভর করে চাঁদ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে আকাশ পথে দূরে, অনেক দূরে। কোথায় কে জানে! এদিকে ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় বুবুনও ককিয়ে কেঁদে ওঠে। তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু আশ্চর্য! মায়ের সঙ্গে ছাদে গিয়ে সে তাকাল চাঁদের দিকে, কিন্তু চাঁদের বুড়িকে সেভাবে পালিয়ে যেতে দেখা গেল না। হয়তো সে আগেই চলে গেছে, তাই।

রিঙ্কির দেখা শীতবুড়ি

আট বছরের মেয়ে রিঙ্কি খেলতে যতটা ভালবাসে তার চেয়ে ঢের বেশী ভালবাসে গল্প শুনতে। এ কথা জেনেই রিঙ্কির মা ওকে গল্প শোনানোর প্রলোভন দেখিয়ে পড়াশুনায় আগ্রহী করে তুলতেন। সকালবেলা রিঙ্কি যখন পড়তে বসত, তখন পাশের বাড়ির টিকলু এক্কা-দোক্কা খেলার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রায়ই এসে হাজির হ'ত রিঙ্কিদের বারান্দায়। কিন্তু মায়ের কথা মনে রেখেই রিঙ্কি সে সময় খেলা করত না, মন দিয়ে পড়াশুনা করত। এতে মা খুশী হতেন এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে প্রতিদিন রিঙ্কিকে একটা করে গল্প শোনাতেন।

একদিন রাত্রিবেলা রিঙ্কি মায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে শুনেছিল শীতবুড়ির গল্প। মা বলেছিলেন,—শীতবুড়ি প্রতি বছর একবার করে মেয়ের বাড়ি আসে নাতি-নাতনীদের দেখতে। কার্ত্তিক মাসের শেষ দিকে শীতবুড়ি যে সময়ে আসে, সে সময়ে আকাশের সূর্যটা দক্ষিণ দিকে বেশ খানিকটা সরে যায়। শীতবুড়ি তার ঝোলায় করে নিয়ে আসে নলেন গুড়ের সন্দেশ, ডালের বড়ি, মটর শুঁটি, ফুলকপি ইত্যাদি অনেক কিছু। মায়ের গল্প বলার মাঝখানে রিঙ্কি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে,—'আচ্ছা মা, শীতবুড়ি কোত্থেকে আসেন?' মা বলেন, 'আমাদের এই দেশের উত্তরে বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে বিশাল হিমালয় পর্ব্বত। সেই পর্ব্বত পেরিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে সাইবেরিয়া অঞ্চল। শীতবুড়ি সেখান থেকেই ঠুক্-ঠুক্ করে লাঠিতে ভর করে এদেশে এসে উপস্থিত হয়।' গল্প শুনতে শুনতে শীতবুড়ির একটা কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে রিঙ্কির চোখে।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রিঙ্কি বারান্দায় মাদুর পেতে

পড়তে বসে। কিন্তু কিছুতেই ওর পড়ায় মন বসে না। শীতবুড়ির একটা কাল্পনিক চেহারা ও গতিবিধির কথা কেবলই ওর মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। এক সময় রিঙ্কি হঠাৎ লক্ষ্য করে—একটা বুড়ি ওদের বাড়ির সামনেকার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রিঙ্কিদের বাড়ির ঠিক উত্তরদিকেই মাঠ ভর্তি শীতের সব্জির চাষ। বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, সিম, মূলো ইত্যাদি সব কিছুরই চাষ-আবাদ হয় সেই মাঠে। মাঠের ওপারের গ্রাম থেকে অপ্রশস্ত একটা রাস্তা এঁকে বেঁকে এসে প্রবেশ করেছে রিঙ্কিদের গ্রামে। সেই পথ ধরেই গ্রামের দিকে আস ছল ঐ বুড়িটা। রিঙ্কি লক্ষ্য করল, মায়ের বলা গল্পের বুড়িটার সঙ্গে ঐ বুড়িটার আশ্চর্য মিল। বুড়িটার কাঁধে ছিল মস্ত বড় একটা ঝোলা। রিঙ্কির সন্দেহ হ'ল নিশ্চয়ই সে শীতবুড়ি। শীতবুড়িটার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য রিঙ্কি দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু বুড়িটা ততক্ষণে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেদিন দুপুরবেলা স্কুল থেকে ফেরার পথে রিঙ্কি দেখতে পেল—একটা বাড়ির উঠানে একটা বুড়ি ডালের বড়ি দিচ্ছে। রিঙ্কি ভাবল, হয়তো ঐ বুড়িটাই শীতবুড়ি। সে ওর সঙ্গী টুম্পাকে জিজ্ঞেস করল বুড়িটাকে সে চেনে কিনা। টুম্পা বলল,--ঐ বুড়িটার নাম নাকি চপলা বুড়ি। চপলা বুড়ির সাত কুলে কেউ নেই। তাই সে ঐ বাড়িতে বারোমাস ঝি-গিরি করে। টুম্পাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই বুড়িটা কাজ করে। তাই সে ঐ বুড়িটা সম্পর্কে এত সব খোঁজ-খবর জানত। এর পরও রাস্তাঘাটে যখনই কোন বুড়িকে দেখত, রিঙ্কি তাকেই ওর মায়ের বলা গল্পের শীতবুড়িটার সঙ্গে তুলনা করে দেখত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই সে মনে-প্রাণে শীতবুড়ি বলে মেনে নিতে পারত না।

সকালবেলা বারান্দায় পড়তে বসে অনেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত রিঙ্কি। সোনালী রোদ মাখা শীতের সকালের দৃশ্যটা প্রাণভরে উপভোগ

করত সে। মনটা মাঝে মাঝেই হারিয়ে যেত উত্তরের মাঠ-ভরা সর্ষে ক্ষেতের হলুদ ফুলের মধ্যে। বাড়ির সামনেকার যে রাস্তাটা মাঠের ওপারে গ্রামান্তরের দিকে চলে গেছে, সেদিকে তাকাতেই রিঙ্কির চোখে পড়ত সারি সারি খেজুর গাছে দড়ি বাঁধা হাড়িগুলো ঝুলছে। রস কাঠিতে ঠোঁট ডুবিয়ে খেজুর রস খাচ্ছে ফিঙে, দোয়েল, বুলবুলি। দূরে পলাশবনে ফুটে রয়েছে বাহারি সব ফুল।

এভাবেই কেটে যায় অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাস। একদিন বিকেলবেলা রিঙ্কি বারান্দায় বসেছিল। প্রতীক্ষা করছিল টিকলুর জন্য। এ সময় প্রতিদিনই ওরা দু'জনে এক্কা-দোক্কা খেলে। হঠাৎ রিঙ্কির কানে ভেসে এল কোকিলের কুহু-ধ্বনি। রিঙ্কির মনে হ'ল, রাস্তার ও-পিঠের কোন গাছের ডালে বসেই বুঝি কোকিলটা ডাকছিল। রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতেই রিঙ্কি দেখল,—একটা বুড়ি রাস্তা দিয়ে লাঠিতে ভর করে উত্তরদিকের মাঠের পানে হেঁটে যাচ্ছে। মাস তিনেক আগে যে বুড়িটা একই রাস্তায় গ্রামে এসে ঢুকেছিল, এ বুড়ি যে সেই বুড়ি এতে রিঙ্কির মনে কোনই সন্দেহ রইল না। সন্দেহ রইল না যে, ঐ বুড়িটাই শীতবুড়ি! রিঙ্কি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখল, শীতবুড়িটার কাঁধের ঝোলাটা এবার একেবারেই শূন্য। তিন মাস আগে শীতবুড়িটা ঝোলা ভর্তি করে যে সব সামগ্রী বয়ে এনেছিল, সে সবই উজাড় করে দিয়ে সে এখন ফিরে যাচ্ছে। একটু পরেই দূরে আবারও শোনা গেল কোকিলের সুমধুর কুহু-ধ্বনি। বোঝা গেল, শীতের শেষে বসন্তের আগমনের আর দেরী নেই।

হারিয়ে পাওয়া

সান্ত্বা পিসিদের শান্তিপুরের বাড়ি থেকে পল্টু একটা পায়রা এনেছিল। পায়রাটাকে শিবিন্দির মিস্ত্রী যে ঘরটা তৈরি করেছিল তাতেই রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ছোটকাকুই পল্টুর আবদার রক্ষা করার জন্য পয়সা খরচ করে চমৎকার ঘরটা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। ঘর মানে প্যাকিং বাক্স দিয়ে তৈরি খুপরি ঘর। তা হোক, তবু ঘরটা বেশ পছন্দ সই হয়েছিল সকলের। পল্টুর তো বটেই।

উঠোনের একপাশে চারটে লম্বা বাঁশ পুঁতে তারই ওপর খুপরি ঘরটাকে চাঙ্গা করে বসানো হয়েছিল। প্রতিদিন সকালবেলা পুব আকাশে ভোরের সূর্য উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই আড়মোড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে পল্টু। উঠোনে এসে ছোট্ট একটা মই বেয়ে উপরে উঠে যায়। তারপর খুপরি ঘরটার কুলুপটা খুলে দিতেই মুহূর্তে ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে পায়রাটা। উড়ে গিয়ে বসে কখনও বা ডালিম গাছের ডালে, আবার কখনও বা খড়ের ছাউনি দেয়া ঢেঁকি-ঘরের চালে।

সারাদিন ধরে পায়রাটা উঠোনে খুঁটে খুঁটে খায়। মাঝে মাঝে পল্টু টি-টি করে ডাকে। ডাক শুনে পায়রাটা ছুটে আসে ওর কাছে। পল্টু তখন আদর করে ভেজানো ছোলা, শুকনো গম বা চালের খুদ ছিটিয়ে দেয় উঠোনে। পায়রাটা খুঁটে খুঁটে খায় সেগুলো। তারপর আপন মনে স্বচ্ছন্দে পায়চারী করে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে পল্টুদের হুলো বেড়ালটা তাড়া করে পায়রাটাকে। পায়রাটা তখন উড়ে গিয়ে খড়ের চালে গিয়ে বসে। উঠোনের অধিকার নিয়ে বেড়াল আর পায়রার দ্বন্দ্বটা উপভোগ করে পল্টু।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে পল্টু অবাক হয়ে গেল। পায়রাটাকে কাছে-পিঠে কোথাও দেখা গেল না। পল্টুর সন্দেহ হ'ল নিশ্চয়ই উঠোনের অধিকারের দ্বন্দ্বে হুলো বেড়ালটা আজ পায়রাটাকে পাকড়াও করে পর্যুদস্ত করেছে। উঠোনের একপাশে লাউ মাচানের নিচে সটান শুয়েছিল হুলোটা! পল্টু এগিয়ে গেল সেদিকে। কিন্তু ভাব-লক্ষণ দেখে ওকে যেন নির্লিপ্ত ও নির্দোষ বলেই মনে হ'ল পল্টুর।

এরপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। কিন্তু পায়রাটার খোঁজ পাওয়া গেল না। পল্টুদের পাড়ায় খগেন হালদার, অবনী তরফদার এবং ফণী বৈরাগী পায়রা পোষে। সে সব বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া হ'ল। কিন্তু না, পল্টু কোথাও হদিশ পেল না পায়রাটার। পল্টু একটা বইয়ে পড়েছিল পায়রার বুদ্ধির কথা। আগের দিনে নাকি পায়রার ডানায় চিঠি বেঁধে দিলে সেই চিঠি সে পৌঁছে দিত যথাস্থানে। এসব কথা ভেবেই পল্টু শান্তিপুরের সান্তা পিসির বাড়ি গিয়েও খোঁজ নিল। কিন্তু সেখানেও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না পায়রাটার।

ইতিমধ্যে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। পায়রাটার কথা পল্টু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা পল্টু দাওয়ায় বসেছিল। সেই সময় এক ঝাঁক বুনো পায়রা দ্রুত উড়ে প্রায় উঠোনের ডালিম গাছটার মাথার ওপর নেমে এসেছিল। পরক্ষণেই বোঝা গিয়েছিল এর কারণটা। একট ধাউস বাজপাখির তাড়া খেয়েই ঐ ভাবে বুনো পায়রাগুলো গোত্তা দিয়ে নেমে এসেছিল নিচে।

একটু সময় পরই পত্‌পত্‌ শব্দে উড়ে গিয়েছিল পায়রাগুলো। সেই সময় পায়রাগুলোর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে পল্টু দেখল—ঐ বুনো পায়রাগুলোর মধ্যে রয়েছে একটা পোষা পায়রা। পায়রাগুলো তখনও ঘুরপাক খাচ্ছিল আকাশে। পল্টুর সন্দেহ হ'ল,—ঐ পোষা পায়রাটা হয়তো বা নিশ্চয়ই ওর সেই হারানো পায়রা। বিকেলে ছোটকাকু কলেজ থেকে ফিরতেই পল্টু ছোটকাকুকে সব কথা খুলে বলল। সব কথা শুনে ছোটকাকু কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'দেখি তোর পায়রাটা

ধরে দিতে পারি কি না।' কখন, কিভাবে এবং কোত্থেকে পায়রাটাকে ধরে দেবেন তা কিছুই বললেন না ছোটকাকু। পল্টু অবশ্য একটুও অবিশ্বাস করল না সেই কথা। কেননা, ছোটকাকুর অসাধ্য যে কিছু নেই তা সে বেশ ভালভাবেই জানত। গাছের মগ ডালে উঠে পাখির বাসা থেকে বাচ্চা পেড়ে আনা, চৌধুরীদের পুকুরপাড়ের গর্ত থেকে মাছ-রাঙার বাচ্চা ধরা ইত্যাদি কাজে ছোটকাকু যে ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধ-হস্ত তার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল পল্টু।

সন্ধ্যেবেলা একটা টর্চ হাতে ছোটকাকু এসে হাজির হলেন পল্টুর পড়ার ঘরে। তারপর ইঙ্গিতে ডাকলেন পল্টুকে। পল্টু নীরবে অনুসরণ করল ওর ছোটকাকুকে। ছোটকাকু ও পল্টু দু'জনে অনেকটা পথ পেরিয়ে চৌধুরীদের পুরানো প্রকাণ্ড দালান—বাড়ীর দেউড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকতেই অন্ধকারে কয়েকটা চামচিকে মাথার ওপর দিয়ে এদিক-ওদিক উড়ে গেল। বোঝা গেল, ছোটকাকু ও পল্টুর আগমন ওদের অভিপ্রেত নয়। এরপর টর্চের তীব্র আলো দেউড়ির কার্নিশে ফেলতেই দেখা গেল একঝাঁক পায়রা। টর্চের আলোটাকে কার্নিশের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক জায়গায় স্থির ভাবে ধরলেন ছোটকাকু। তারপর আলোটা হঠাৎ নিভিয়ে দিতেই পাখনা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নিচে এসে পড়ল একটা পোষা পায়রা। ধূসর রঙের পায়রাটার কপালে সাদা তিলক দেখে পল্টুর চিনতে দেরী হ'ল না, ওটাই ওর সেই হারানো পায়রা। হারানো পায়রাটকে ফিরে পেয়ে পল্টুর মন আনন্দে নেচে উঠল।

সার্কাসের কুকুর

সকালবেলা একটা স্বপ্ন দেখেই ঘুম ভাঙল বুবুনের। শীতের আমেজটুকু উপভোগ করতে করতে বুবুন বারবার ভাবতে লাগল স্বপ্নের কথাগুলো। এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে তার চেয়ে সুখের আর কিছুই হ'তে পারে না বুবুনের কাছে। বুবুনের মনে পড়ে ঠাকুমার কথা। ঠাকুমা বলতেন,—ভোরের স্বপ্ন কখনও নিষ্ফল হয় না। সে কথা ভেবেই ক্রমশঃ বিশ্বাসী হ'য়ে উঠে বুবুনের মনটা। আজই ওদের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বের হ'বে। বুবুন স্বপ্নে দেখেছে, সে সব বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুবুন যখন পরম তৃপ্তিতে স্বপ্নের কথা ভাবছিল, ঠিক তখনই ওর কাণে এল কথাগুলো। পাশের বাড়ির ঝুমার মা ওর মাকে বলছেন—বুড়ো শিবতলার মাঠে সার্কাসের দল তাঁবু ফেলেছে। ঝুমাদের বাড়ির টিউবওয়েলের চাতালের উপর দাঁড়িয়ে ঝুমার মা রান্না-ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো বুবুনের মায়ের সঙ্গে সার্কাস প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলছিলেন। ছু'জনের আলোচনায় সার্কাসে কি কি খেলা দেখানো হচ্ছে, ক'টা হাতি, ক'টা বাঘ, এ সবও বাদ পড়েনি।

প্রতি বছরই শীতকালের এই সময়টায় বুড়ো শিবতলার মাঠে সার্কাসের দল খেলা দেখাতে আসে। এ বছরও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সার্কাস দেখা এবং দেখানোর এটাই প্রশস্ত সময়। কেননা, গাঁয়ে-গঞ্জে হেমন্তের সোনালী ফসল ঘরে তুলে এ সময়টাতেই গেরস্ত লোকেদের হাতে ছু'টো পয়সা আমদানি হয়। এ কথা সার্কাসওয়ালারাও বিলক্ষণ জানে। তাছাড়া, এ সময় বৃষ্টি বাদলের ঝুট্-ঝামেলা থাকে ন এবং ছেলেমেয়েদের বার্ষিক পীরক্ষার পর্বটাও চুকে যায়।

সার্কাসের কথা শুনে গত বছর সার্কাস দেখার দিনটির কথা মনে পড়ে যায় বুবুনের। —বিকেলবেলা বুবুন এবং পাশের বাড়ির ঝুমা যখন ওদের উঠোনের একপাশে বেননী ছুলিয়ে ছুলিয়ে মহানন্দে একা-

দোক্কা খেলছিল, ঠিক সেই সময় বুবুনের ছোটকাকা এসে বলেছিলেন সার্কাস দেখতে যাওয়ার কথা। শুনে খুশীতে ডগমগ হ'য়ে উঠেছিল বুবুন।

যথাসময়ে ছোটকাকার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিল বুবুন। বুড়ো-শিবতলার মাঠ তখন লোকে-লোকারণ্য। বিরাট একটা তাঁবুর নিচে সার্কাসের আসর বসেছিল। তাঁবুর উপরে সার্চ্চ-লাইটের তীব্র আলোটা [illegible] তে ঘুর[illegible] [illegible]ছিল। ভিতরে ঢুকে গ্যালারিতে [illegible] পাটির ঠিক পেছনেই বসেছিল ওরা। প্রতিটি খেলাই ছিল [illegible]নবদ্য, প্রাণবন্ত, বিস্ময়কর এবং আকর্ষণীয়। লোমহর্ষক বাঘের খেলা, ব্যালেন্সের খেলা, ভালুকের সাইকেল চালানো ইত্যাদি একের পর এক চমক সৃষ্টি করেছিল বুবুনের মনে। কিন্তু বুবুন সবচেয়ে অবাক- হ'য়েছিল —একটা কুকুর কিভাবে দর্শকদের বলা সংখ্যাগুলোর গুণফল অনায়াসে ঠিক ঠিক কষে ফেলছে তা' দেখে।

গত বছর সার্কাস দেখে আসার ক'দিন পরই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল জানা যায় এবং তাতে দেখা যায় বুবুন অঙ্কে পাশ করতে পারেনি। একদিকে সার্কাসের কুকুরটার কৃতিত্ব এবং অন্যদিকে নিজের এই ব্যর্থতা বুবুনের মনে প্রথম প্রথম এক নিদারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু অচিরেই সে ফিরে পেয়েছিল প্রবল আত্ম-বিশ্বাস। সার্কাসের কুকুরটার দৃষ্টান্ত দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল বুবুন। এরপর অঙ্ক বিষয়টাকে আয়ত্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সে।

…সেদিন দশটা বাজতে না বাজতেই স্কুলের পথে পা বাড়ালো বুবুন। বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে জানা গেল—অঙ্কে বেশ ভাল নম্বর পেয়েই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে বুবুন। অঙ্কের স্যার ভূপতিবাবু বুবুনের কৃতিত্বের জন্য তারিফ করলেন ওকে। বুড়ো-শিবতলার মাঠের পাশ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বুবুন কেবলই ভাবতে লাগল ভোরের স্বপ্ন সফল হওয়ার কথা। ভাবতে লাগল সার্কাসে কুকুরটার কথাও। সার্কাসের কুকুরটার প্রতি এত অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল বুবুনের মন।

দোলনা

সেদিন সকাল থেকেই খোকন কাঁদছিল। আগের দিন ছোটমামা খোকনকে পাশের গ্রাম ফুলেশ্বরীর মেলা থেকে একটা বেতের তৈরি দোলনা কিনে এনে দিয়েছিল শখ করে। আরও কিনে দিয়েছিল শোলার তৈরী কতকগুলো চমৎকার রঙিন পাখি এবং ফুলের ঝাড়। বড়দি এবং তার ছেলে খোকনের উপর ছোটমামার বরাবরই খুব টান। ছোটমামা জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে এসেছে যে এই বড়দিই তাকে স্নান করিয়েছে, জামা-প্যান্ট পরিয়ে দিয়েছে, চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ে দিয়েছে, চোখে কাজল এবং কপালে কাজলের টিপ পরিয়ে দিয়েছে। একটু বড় হলেও বড়দি যখন এসব কাণ্ড করতেন, তখন ছোটমামার কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করত। কিন্তু বড়দির ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তার হতো না। ছোটমামার স্পষ্ট মনে পড়ে, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় ছোটমামাকে কোলে টেনে নিয়ে খুব একচোট কেঁদেছিলেন ওর বড়দি।

এহেন বড়দির ছেলে খোকনকে ছোটমামা খেলনা এবং দোলনা কিনে দেবে না তো দেবে কাকে! বড়দির বিয়ে হয়েছিল পাশের গ্রামে। বড়দির বাড়ি সে প্রায়ই যাতায়াত করত। ছোটমামার বয়স সবে এগারো পেরিয়ে বারোয় পড়েছে। তাই মামা হলেও সে এখনও হাফ-প্যান্ট পরে। খোকনকে অনেক কিছুই কিনে দিতে তার মনে সাধ জাগে। কিন্তু সাধ থাকলেও সামর্থ্যের অভাব। তবু মেলা উপলক্ষে বাবা-কাকারা যে পার্বনী দিয়েছিলেন তা দিয়েই সে দোলনা ও খেলনা কিনে এনেছিল খোকনের জন্য।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ছোটমামা খোকনকে বিছানা থেকে

তুলে নিয়েছিল এবং কাঁধের ওপর রেখে পায়চারি করছিল উঠানে। ছোটমামাকে পেয়ে খোকনও মহাখুশি। ছোটমামার কাঁধে মুখ রেখে খোকন নানা রকম শব্দ করছিল। কিছুক্ষণ উঠানে পায়চারি করে ছোটমামা খোকনকে শুইয়ে দিয়েছিল দোলনায়। দোলনাটা কিনে এনে অফুরন্ত উৎসাহে ছোটমামা আগের দিন বিকেলেই সেটাকে মোক্ষদা ঝির সহায়তায় বারান্দায় টাঙিয়ে দিয়েছিল। আর ঠিক দোলনার ওপরেই শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল রঙচঙে শোলার পাখি এবং ফুলের ঝাড়।

দোলনায় শুয়ে শুয়ে শোলার পাখি এবং ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে খোকনের সে কী আনন্দ! অবিরাম হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খোকন তার আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিল। কিন্তু তা খুবই অল্প সময়ের জন্য। তারপর যেই ছোটমামা দোলনাটাকে একটু জোরে দুলিয়েছিল, অমনি খোকন চেঁচাতে শুরু করল। ছোটমামা ভাবল—হয়তো বা জোরে দোলানোর জন্যই খোকনের এই কান্না। তাই সে দোলনাটাকে খুব ধীরে ধীরে দোলাতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য! এতেও খোকনের কান্না থামলো না। সে আগের মতই গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলো।

কেন এই কান্নার কারণ, তা জানতে বাড়িশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। খোকনের মা এসে খোকনকে তাড়াতাড়ি দোলনা থেকে তুলে নিলেন এবং নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। সুশান্তবাবু খোকনের পেটটা ফেঁপেছে কিনা, গতরাত্রে খোকনকে কি খাওয়ানো হয়েছিল ইত্যাদি সব খোঁজ-খবর নিলেন। মোক্ষদাকে বললেন দোলনার বিছানাটা উল্টে-পাল্টে দেখতে—তাতে কাঠ-পিঁপড়ে বা ছারপোকা আছে কিনা। কর্তাবাবুর কথামতো মোক্ষদা বারবার দোলনার বিছানাটা উল্টে-পাল্টে দেখলো এবং কোন কিছু না পেয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে ছোট-মামাকে কটাক্ষ করে বলল,—'ঝ্যাটা মার!' এতে ছোটমামার খুবই রাগ হলো। কারণ, সে জানত না যে, ওটা আসলে মোক্ষদার মুদ্রা-দোষ।

যাহোক্, অগত্যা ব্যাপারটার কোনই হদিশ করতে না পেরে পাড়ার

বিশ্বনাথ ডাক্তারকে ডাকা হলো। বিশ্বনাথবাবু এলেন এবং খোনককে ভাল করে দেখলেন। কিন্তু তিনিও এর কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো খোকনকে নিয়ে। খোকনের বাবা সুশান্তবাবু খোকনকে কোলে নিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালেন। লেজ ঝোলা পাখি দেখানো থেকে শুরু করে নানাভাবে খোকনের মন ভোলাতে এবং তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলোনা।

ঠিক এমনি সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে এসে উপস্থিত হলো দোলনা-বিক্রেতা লোকটি। লোকটি ছোটমামার খুবই পরিচিত। সে এসেই দোলটাকে ঐভাবে টাঙানো দেখে ছোটমামাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'কি গো খোকাবাবু! দোলনাটাকে ঐভাবে টাঙিয়েছ কেন? ওভাবে টাঙালে তো ওটা যখন দুলবে, তখন ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ হবে। ওতে চারটে গোল রিং লাগিয়ে নিতে বলেছিলাম না?'—লোকটির কথায় সকলের কাছেই খোকনের কান্নার কারণটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। সকলেই বুঝলো যে, ঐ ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দই খোকনের কান্নার কারণ। ব্যাপারটা মোক্ষদাও বুঝলো। সে ভ্রু-কুঁচকে ছোটমামার দিকে একবার মাত্র আড়চোখে তাকাল এবং বলল,—'ঝ্যাটা মার'।

পরিবর্ত্তন

পিংকু ভয়ানক দুষ্টু ছেলে [illegible]ার অত্যন্ত [illegible]। দুষ্টুমিতে ওর জুড়ি নেই। সে যে কখন [illegible] কাণ্ড করে বসে [illegible] আশঙ্কায় পিংকুর মা-বাবার মনে একটুও শান্তি নেই। এমন একটা দিনও নেই, যেদিন সে একটা না একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। পাড়ার দুষ্টু ছেলে-দের সে হলো এককথায় লিডার বা দলপতি। রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মতোই পিংকুর কথায় পাড়ার আর সব দুষ্টু ছেলে ওঠে বসে

যদিও দুষ্টুমিতে পিংকুর কোন জুড়ি নেই, তথাপি আশ্চর্যের বিষয়—তার এই পনেরো বছরের স্বল্প পরিসর জীবনে বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা কিন্তু একটি দিনও ঘটেনি। এটা তার মা-বাবার আশীর্ব্বাদ অথবা ঈশ্বরের করুণা, তা বলা মুশকিল। কেননা, পিংকুর মা সর্ব্বদাই তাঁর আরাধ্য দেবতাকে ডেকে বলেন, 'ঠাকুর, পিংকুকে তুমি দেখো, ওর যেন কোন ক্ষতি না হয়।' রাত্রে শুয়ে শুয়ে প্রায় প্রতিদিনই পিংকুর মা-বাবা ওকে অনেক করে বোঝাতেন। মা-তো প্রায়ই বোঝাতেন এবং বোঝাতে বোঝাতে শেষ পর্যন্ত কেঁদেই ফেলতেন। আঁচলে চোখ মুছে বলতেন, —'হ্যাঁরে পিংকু, তুই কি মানুষ হবি না রে? রোজ রোজ তোর নামে পাড়ার লোকের নালিশ শুনতে হবে? আমি যে আর পারছি না বাবা এসব সহ্য করতে।' মা যখন এসব বলতেন, পিংকু তখন শান্ত-শিষ্ট সুবোধ বালকের মতই চুপ করে থাকতো। একটা কথাও বলত না। তখন তাকে কেউ দেখলে মনে করবে যে, সে মোটেই তেমন দুষ্টু ছেলে নয়। পাড়া-প্রতিবেশীরা অযথাই ওর নামে যত সব অবান্তর কথা বলে বেড়ায়, বদনাম রটনা করে।

সকালবেলা দাড়ি কামাতে কামাতে পিংকুর বাবা পিংকুকে ডেকে বললেন, 'পিংকু, তুই নাকি ডাব চুরি করেছিস? তোর মা বলছিল।' পিংকু চুপ করে থাকাতে বাবা বুঝলেন ঘটনাটা সত্য। রেগে বললেন, —'তুই এখন বড় হয়েছিস। ক্লাশ নাইনে পড়িস্। পড়াশুনা না করলে খাবি কি করে?'

বাবাকে খুব ভয় পায় পিংকু। তাই সে মাথা নিচু করে চুপচাপ চলে আসে সেখান থেকে। সোজা চলে যায় পড়ার ঘরে। তারপর ইংরাজী বইটা খুলে নিয়ে ক্যাসাবিয়াঙ্কর গল্পটা পড়তে থাকে। পড়তে থাকে ঠিক ততক্ষণই, যতক্ষণ ওর বাবা বাজারের ব্যাগটা নিয়ে বাজাব করতে না যান। বাবা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই সে মনে মনে ভাবতে থাকে ডাব চুরির কথাটা। তাবে —চৌধুরীদের বাগানের ডাব চুরির কথা মা জানলো কি করে? তবে কি গোপালই এসব কথা মায়ের কাছে লাগিয়েছে? ভাবতে ভাবতে সে মনে মনে গোপালের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। গোপাল যে আজকাল ওর পিছনে লেগেছে, সে যে পিংকুর মায়ের কাছে তার নামে নালিশ করছে সে বিষয়ে পিংকুর মনে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ রইল না। গোপালের কথা যতই মনে হয়, ততই রাগ চড়তে থাকে পিংকুর। এমন সময় হঠাৎ বাড়ির পিছনের বাগানের দিক থেকে একটা জোর 'সিটি'র শব্দ শুনতে পেল ও। বুঝলো, ঘোতন এসেছে। কিন্তু পাল্টা 'সিটি' দিয়ে প্রত্যুত্তর দেবার উপায় নেই। মুখের ভিতর আঙুল পুরে দিয়ে 'সিটি' বাজানোর ব্যাপারটা পিংকুর মা আগে বুঝতেন না। কিন্তু ইদানিং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি তা বুঝে ফেলেছেন। তাই রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলেন, 'পিংকু, এখন কোথাও যাস্নে। তোর বাবা কিন্তু এক্ষুনি এসে পড়বেন। যদি দেখেন তুই বাড়ি নেই, তা'হলে আর রক্ষে থাকবে না।' পিংকু মায়ের কথা শোনে আর ভাবে - মা-র ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই। আমি কি এতই বোকা নাকি যে, এখন বাড়ির বাইরে যাব? পিংকুর তখন একটু একটু মায়াও হয় ওর মায়ের ওপর। কিন্তু পর মুহূর্তেই ওর মন বিগড়ে যায়।

যোভন এসে বসে আছে বাগানে। ওর জন্য অপেক্ষা করছে। বেরোতে পারলে কি মজা হতো। অথচ বাবার ভয়ে বেরুনো যাচ্ছে না। মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করে পিংকু।

দেখতে দেখতে বেলা দশটা বেজে যায়। পিংকু বইপত্তর রেখে ওঠে। বিকেল অবধি সে ঠায় বাড়িতে আটকা পড়ে থাকে। কেননা অন্যান্য রবিবার বিকেলের দিকে ওর বাবা বাড়ি থাকেন না। দত্ত বাড়ির কাকার সঙ্গে দাবা খেলতে চলে যান। কিন্তু এদিন ছিল তার ব্যতিক্রম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে একগুচ্ছ কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছেন আর উঠবার নাম-গন্ধ নেই। তাই বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়ির বাইরে রাস্তায় একটুখানি পায়চারি করেই বাড়ি ফিরে এলো পিংকু।

পরদিন পনেরোই আগস্ট। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্কুল ছুটি। কিন্তু ছুটি হলেও সকালবেলা জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরি—এসবের প্রোগ্রাম আছে। তাই ঘুম থেকে উঠেই পিংকু স্কুলের পথে পা বাড়ালো। স্কুলের অনুষ্ঠানের শেষে কয়েকজন মাষ্টারমশাই এবং ছাত্র-ছাত্রী মিলে পিংকুরা গেল হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ করতে। হাসপাতালে গিয়ে ওরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঢুকে পড়লো একটা করে ফলের ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে। পিংকু যে ওয়ার্ডে গেল সেটা ছিল 'ইমারজেন্সি ওয়ার্ড'। সেখানে গিয়ে পিংকু দেখল—কারও হাত ভাঙ্গা তাই হাতে ব্যাণ্ডেজ, আবার কারও বা মাথা ফেটে গেছে তাই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। সারাটা ওয়ার্ড জুড়ে প্রায় একই দৃশ্য। একটা বেড-এ পিংকু দেখল—ওর বয়সী একটা ছেলে 'মাগো—বাবাগো' বলে অনবরত চেঁচাচ্ছে। ভয়ানক যন্ত্রণায় ছট্‌পট্‌ করছিল ছেলেটি। ছেলেটির পাশেই বসেছিলেন ওর মা। তিনি ছেলেটির মাথায় হাত বুলোচ্ছিলেন এবং অঝোরে কাঁদছিলেন। পিংকু এগিয়ে গেল সেখানে। একটা ফলের প্যাকেট দিয়ে প্রশ্ন করে জানতে পারলো সব ঘটনা। ছেলেটি ডাব পারতে উঠেছিল। গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ওর হাত-পা ভেঙ্গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পিংকুর মনে পড়লো ওর নিজের মায়ের কথা।

পিংকু যদি কখনও গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ঐ ভাবে হাত পা ভাঙে তা'হলে ঐ ছেলেটির মায়ের মতোই তিনিও তো দুঃখ পাবেন। ছেলেটির মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই মুখখানির মধ্যে পিংকু খুঁজে পেল তার নিজের মায়ের মুখচ্ছবি। সে প্রতিজ্ঞা করলো, আর কখনও মা-বাবার অবাধ্য হ'বে না। আর কখনও গাছে উঠবে না, দুষ্টুমি করবে না। ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতোই সেও তার বাবার অনুগত ও বাধ্য হয়ে উঠবে।

বাড়ি ফিরেই পিংকু সোজা চলে গেল রান্নাঘরে। মা তখন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পিংকু চুপিচুপি গিয়ে পিছন থেকে ওর মায়ের চোখ চেপে ধরলো দু'হাতে। মা বললেন, 'ছাড়, ছেড়ে দে পিংকু। দুধটা উত্‌লে পড়ে যাবে যে!' মায়ের চোখ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎই মা-কে প্রণাম করে পিংকু ছুটে গেল ঘরের বাইরে। পিংকুর এই আচরণ ওর মা-র বোধগম্য হলো না। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। অবাক হলো বিকেলে ঘোতনও, যখন পিংকু বললো—তুই যা, আমি আর ডাব গাছে চড়বো না রে ঘোতন।'